তাকদিরের হাকীকত

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদি

ভূমিকা

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার পটভূমি এই যে, হিজরী ১৩৫২ সাল মোতাবেক ১৯৩৩ সালে আমি যখন তরজুমানুল কুরআন নতুন নতুন প্রকাশ করেছি, তখন জনৈক ব্যক্তি[১] আমাকে একটি দীর্ঘ চিঠি লেখেন। কুরআন শরীফকে বুঝে পড়তে গেলেই তাকদীর বা অদৃষ্ট সংক্রান্ত বিষয়ে যে জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়, তার সমাধান দেওয়ার জন্য ঐ চিঠিতে অনুরোধ করা হয়েছিল। কেননা কতক আয়াত এমন যে, তা থেকে বুঝা যায়, মানুষ সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ইচ্ছা ও ক্ষমতায় পরিচালিত এবং তার নিজস্ব কোন স্বাধীনতা ও ক্ষমতা নেই। অপরদিকে কোন কোন আয়াত ঠিক এর বিপরীত, মানুষের পূর্ণ স্বাধীনতা ও ক্ষমতা রয়েছে–এরূপ ধারণার সমর্থক। বাহ্যত: এই উভয় ধরনের আয়াতে সুস্পষ্ট বৈপীরীত্য পরিলক্ষিত হয় এবং তা সহজে নিরসন করা যায়না। আমি ঐ চিঠিটা হুবহু পত্রিকায় ছেপে দেই এবং তার জবাবে একটা বিস্তারিত প্রবন্ধ লিখি। সেই প্রশ্ন ও তার জবাব বর্তমান পুস্তকের আকারে প্রকাশ করা হচ্ছে।

তার চিঠিখানা নিম্নরূপঃ

"মানুষের জন্য পুরস্কার ও শাস্তি প্রাপ্তি যে অবধারিত ও বাধ্যতামূলক এটাকে যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ করতে হলে প্রথমে তার প্রতিটি কাজকে তার ইচ্ছা ও নিয়তের অধীন বলে সাব্যস্ত করা এবং সেই নিয়ত ও ইচ্ছার ওপর যে অন্য কোন শক্তির নিয়ন্ত্রণ নেই তাও নিশ্চিত করা অপরিহার্য। মহাবিজ্ঞানময় গ্রন্থ কুরআনের সমস্ত শিক্ষার সারনির্যাস এই যে, মানুষের ওপর তার কার্যকলাপের দায়–দায়িত্ব অর্পন

---

[১] একটা ঐতিহাসিক মজার ব্যাপার হিসাবে এ কথা প্রকাশ করা দুষণীয় হবেনা যে, ইনি ছিলেন চৌধুরী গোলাম আহমদ পারভেজ (যিনি পরবর্তীকালে হাদীস অস্বীকারকারী গোষ্ঠীর নেতা হিসাবে আবির্ভূত হন।)

করার পরই তাকে জবাবদিহী করতে বাধ্য করা যায়, তার আগে নয়। গোমরাহী ও হেদায়াত, আযাব ও সওয়াব, সুখ ও দুঃখ, বিপদ ও শান্তি এক কথায় দুনিয়া ও আখেরাতের দাঁড়িপাল্লার দুটো পাল্লাই তার কৃতকর্মের স্বাভাবিক ফল হওয়া চাই। আর এই ফল প্রকাশ পাওয়া চাই একটি নির্দিষ্ট সাধারণ নিয়মের আওতাধীন। কিন্তু কুরআনের কোন কোন আয়াত থেকে এ কথাও জানা যায় যে, মানুষের ইচ্ছাও আল্লাহর ইচ্ছার অধীন।

উদাহরণস্বরূপ, গোমরাহী ও হেদায়াত সম্পর্কে একদিকে তো এমন খোলাখুলি ও সুস্পষ্ট আয়াত বিদ্যমান, যাতে আলো ও অন্ধকার, ঈমান ও কুফর এবং বিপথ ও সুপথ অবলম্বন করাকে মানুষের আপন ইচ্ছা ও চেষ্টার অধীন বলা হয়েছে।

إِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ إِمَّا شَاكِرًا وَّإِمَّا كَفُوْرًا (الدهر: ٣)

"আমি মানুষকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি। এখন সে ইচ্ছা হয় কৃতজ্ঞ হোক, ইচ্ছা হয় অকৃতজ্ঞ হোক।" (আদ্ দাহর--৩)

وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ (البلد: ١٠)

"আমি তাকে দুটো পথই দেখিয়েছি।" (আল বালাদ–১০)

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (عنكبوت: ٦٩)

"যারা আমার পথে চেষ্টা–সাধনা করে আমি তাদেরকে আমার পথ দেখাই।" (আনকাবুত)

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ (الكهف: ٢٩)

"যার ইচ্ছা হয় ঈমান আনুক আর যার ইচ্ছা হয় কুফরী করুক।" (কাহ্ফ–২৯)

পক্ষান্তরে কিছু কিছু আয়াতে এই জিনিসগুলোকে আল্লাহর ইচ্ছার অধীন বলা হয়েছে।যেমনঃ

فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ (ابراہیم:٤)

"আল্লাহ যাকে ইচ্ছা গোমরাহ করে দেন, যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করেন।" (ইবরাহীম-৪)

مَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْٓا اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ (انعام:١١١)

"আল্লাহ না চাইলে তারা কখনো ঈমান আনতে প্রস্তুত ছিলনা।" (আনয়াম-১১১)

সূরা মুদ্দাস্‌সিরের ৫৫ আয়াতে فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ (যার ইচ্ছা হয় এই কিতাব থেকে উপদেশ নিক) এবং সূরা তাকভীরের ২৮শ আয়াতে

اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِيْمَ (٢٨)

"এ গ্রন্থ সারা বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ, বিশেষত: তোমাদের মধ্যে যারা সরল ও সঠিক পথে চলতে চায় তাদের জন্য।" এ দুটো কথা বলে কুরআন থেকে হেদায়াত লাভের জন্য মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এর পর পরই যথাক্রমে وَمَا يَذْكُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ

"আল্লাহর ইচ্ছা না থাকলে তারা উপদেশ গ্রহণ করতেই পারেনা" এবং

وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ط

"আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তোমরা ইচ্ছাও করতে পারনা" -এ কথা বলে এই ইচ্ছাকে আল্লাহর ইচ্ছার অধীন বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে।

এ কথা সত্য যে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে গোমরাহীর জন্য এই নিয়ম নির্ধারণ করা হয়েছে যে,

وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ ط (البقرة:٢٦)

"আল্লাহ এই কুরআন দ্বারা শুধু পাপাসক্ত ব্যক্তিদেরকেই বিভ্রান্ত করেনা" (বাকারা–২৬)

وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ (ابراهيم : ٢٧)

"আল্লাহ সীমা অতিক্রমকারীদেরকে গোমরাহ করে থাকেন।" (ইবরাহীম–২৭)

بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ (النساء : ١٥٥)

"বরং আল্লাহ তাদের অবাধ্যতার দরুন তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দিয়েছেন।" (নিসা–৫৫)

صَرَفَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ (التوبة ١٢٧)

"তারা নির্বোধ লোক ছিল বলেই আল্লাহ তাদের মনকে বিপরীতমুখী করে দিয়েছেন।"(তাওবা–১২৭)

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اِذْ هَدٰىهُمْ حَتّٰى
يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّا يَتَّقُوْنَ (التوبة : ١١٥)

"এটা আল্লাহর নিয়ম নয় যে, কোন জাতিকে একবার হেদায়াত করার পর পুনরায় গোমরাহ করবেন, যতক্ষণ তাকে কোন জিনিস থেকে বিরত থাকতে হবে তা না জানিয়ে দেন।" (তাওবা–১১৫)

হেদায়াতের জন্যও তিনি বিভিন্ন শর্ত বর্ণনা করেছেন। যেমনঃ

يَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ (الرعد : ٢٧)

"যে ব্যক্তি তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তিনি তাকে নিজের দিকে পরিচালিত করেন।"(রা'দ–২৭)

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (العنكبوت : ٦٩)

"যারা আমার পথে চেষ্টা–সাধনা করে, আমি তাদেরকে আমার পথ দেখাবোই।"(আনকাবুত–৬৯)

وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى (محمد : ١٧)

"যারা হেদায়াত গ্রহণ করে, আল্লাহ তাদেরকে আরো বেশী হেদায়াত দান করেন।" (মুহাম্মাদ–১৭)

এ ধরনের আরো বহু আয়াত রয়েছে। তবে এমন আয়াতও আছে, যাতে বিনা শর্তেই গোমরাহী ও হেদায়াতকে আল্লাহর ইচ্ছা বা অনুগ্রহের ওপর নির্ভরশীল বলে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন ইতিপূর্বে উল্লিখিত এ আয়াতটিঃ

فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ط

"আল্লাহ যাকে ইচ্ছা গোমরাহ করেন, যাকে ইচ্ছা হেদায়াত করেন।" এবং

وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ط

"আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তোমরা কোন ইচ্ছা করতে পারনা।"

অনুরূপভাবে, আযাব ও ক্ষমা সম্পর্কে একদিকে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে যেঃ

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ط (الزلزال-٧)

"যে ব্যক্তি কণা পরিমাণ ভালো করবে, সে তার পুরস্কার দেখে নেবে।" (যিলযাল–৭)

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ - (البقره-٢٨٦)

"যেটুকু ভালো কাজ সে করবে তার সুফল তারই প্রাপ্য, আর যেটুকু দুষ্কর্ম সে করবে তার কুফল তারই প্রাপ্য।" (বাকারা–২৮৬)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا (الجاثيه:١٥)

"যে ব্যক্তি নেক কাজ করবে তার ফায়দা সেই ভোগ করবে আর যে ব্যক্তি খারাপ কাজ করবে তার শাস্তি তাকেই ভুগতে হবে।" (জাসিয়া–১৫)

অপরদিকে কুরআনে এটাও বলা হয়েছে যে,

يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ (آل عمران-١٢٩)

"তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন" (আল ইমরান-১২৯) অর্থাৎ আযাব এবং ক্ষমাও আল্লাহর ইচ্ছাধীন। ক্ষমার ক্ষেত্রে অবশ্য এ কথা বলার অবকাশ আছে যে, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু ও ক্ষমাশীল, তাই মহানুভবতা প্রদর্শন করে গুনাহগারকে মাফ করে দেবেন। কিন্তু يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ "যাকে ইচ্ছা আযাব দেন" এ কথার ব্যাখ্যা এভাবে দেওয়া সম্ভব নয়। বড় জোর এই ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে যে, গুনাহগারদের মধ্য থেকে "যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন।" কিন্তু আয়াতের সঠিক প্রেক্ষপট এ ব্যাখ্যাকে জোরালোভাবে সমর্থনকরেনা।

পার্থিব ঐশ্বর্য ও দারিদ্র সম্পর্কেও পবিত্র কুরআনে অতীতের জাতিগুলোর ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত উল্লেখপূর্বক এই মূলনীতি সমর্থন করা হয়েছে যে, সম্মান ও সৌভাগ্য মূলতঃ ঈমান ও খোদাভীতি, ন্যায়পরায়ণ জীবন যাপন, সৎকর্ম এবং প্রাকৃতিক নিয়মের আনুগত্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং এগুলো লংঘনের ফলে খোদার গজবের আকারে দেখা দিয়ে থাকে অভাব-অনটন ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনা। আল্লাহ বলেনঃ

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ

مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ (المائدة-٦٦)

"তারা যদি তাওরাত, ইঞ্জিল এবং আল্লাহর তরফ থেকে নাজিল করা শিক্ষাকে কার্যকর রাখতো তাহলে তারা তাদের ওপর থেকে ও পায়ের তলা থেকে খাদ্য পেত।" (মায়েদা-৯৬)

এ ধরনের আরো বহু আয়াত রয়েছে। কিন্তু অন্যদিকে নিম্নোক্ত আয়াতগুলোও কুরআনেবিদ্যমানঃ

وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ - (البقرة - ٢١٢)

"আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিনা হিসাবে জীবিকা দান করেন।" (বাকারা–২১২)

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ (آل عمران-٢٦)

"আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা জীবিকা প্রশস্ত করে দেন, আর যার জন্য ইচ্ছা সংকীর্ণকরেন।"(রা'দ)

تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ (آل عمران: ٢٦)

"তুমি যাকে ইচ্ছা পরাক্রান্ত করে দাও আর যাকে ইচ্ছা পর্যুদস্ত কর।" (আল ইমরান–৩৬)

বিপদ–আপদ ও আনন্দের ব্যাপারেও কুরআনের দ্ব্যর্থহীন ফায়সালা এই যেঃ

مَا اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ (الشورى ٣٠)

"তোমাদের ওপর যা কিছু বিপদ–আপদ আপতিত হয়, তা তোমাদের হাতের অর্জিত গুনাহর কারণেই হয়।" (আশ্ শুরা–৩০)

পক্ষান্তরে এ আয়াতটিও আমাদের সামনে বিদ্যমানঃ

"وَاِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَ
اِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ
مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ (النساء ٧٨)

"তাদের কোন কল্যাণ লাভ হলে তারা বলে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, আর কোন ক্ষতি হলে বলে যে, এটা তোমার কাছ থেকে এসেছে। তুমি বলে দাও যে, লাভ ও লোকসান যেটাই হয় আল্লাহর তরফ থেকেই হয়।" (নিসা–৭৮)

কিন্তু এর পরবর্তী আয়াতেই বলা হয়েছেঃ

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ (النساء-٧٩)

"তোমরা কল্যাণকর যা–ই লাভ কর, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। আর যা কিছু অকল্যাণ তোমাদের হয়, তা তোমাদের নিজেদের কারণেই হয়।" (নিসা–৭৯)

কুরআনের পর আমরা যখন হাদীসের দিকে মনোনিবেশ করি তখন দেখি, বহুসংখ্যক হাদীস মানুষকে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে সম্পূর্ণ নিরুপায় ও অসহায় হিসেবে তুলে ধরে। যেমনঃ

إِذَا سَمِعْتُمْ بِجَبَلٍ زَالَ عَنْ مَكَانِهِ فَصَدِّقُوا بِهِ وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ تَغَيَّرَ عَنْ خُلُقِهِ فَلَا تُصَدِّقُوا بِهِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ عَلَى مَا جُبِلَ عَلَيْهِ.

"যখন তোমরা শুনতে পাবে যে, একটি পাহাড় নিজ স্থান থেকে সরে গেছে, তখন তা বিশ্বাস কর। আর যখন শুনবে যে, একজন মানুষের স্বভাব পাল্টে গেছে, তখন তা বিশ্বাস করবেনা। কেননা মানুষ তার জন্মগত স্বভাবের ওপরই বহাল থাকে।"

إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ

"আল্লাহর দুই আঙ্গুলের মাঝে মানুষের মন অবস্থিত। এই মনকে তিনি যেমন ইচ্ছা ঘোরান।"

এক হাদীসে রসূল (সাঃ) বলেছেন যে, "মানুষকে বিভিন্ন স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। তন্মধ্যে কাউকে কাউকে মুসলমান ক'রে সৃষ্টি করা হয়েছে।——"

সংক্ষেপে পত্র লেখকের জটিল প্রশ্নগুলোকে আমি হুবহু তুলে ধরেছি। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তাকদীর সমস্যা পৃথিবীতে ধর্মের মতই প্রাচীন এবং কিছুটা জটিলও বটে। প্রত্যেক ধর্মেই এ সম্পর্কে কিছু না কিছু বক্তব্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে যেমন ভারতে ও গ্রীসে পুনর্জন্মবাদ ও কপালের লিখনের ফ্যাকড়া তুলে মানুষকে সম্পূর্ণরূপে অসহায় ও নিরুপায় বানিয়ে দেওয়া

হয়েছে। তেমনি ইরানের অগ্নি উপাসকরা স্রষ্টাকে একেবারেই অক্ষম ও নিষ্ক্রিয় দেখিয়েছে। ফিরিঙ্গি দার্শনিকদের একটি গোষ্ঠী যেমন স্রষ্টাকে একজন ঘড়ি নির্মাতার মত মনে করেছে, যিনি একবার ঘড়ি তৈরী করার পর তাকে নিয়ম-কানুনের আওতাধীন করে দিয়ে নিজে নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছেন, তেমনি আমাদের সমাজে জাবরিয়া (মানুষকে স্বাধীনতাহীন এবং স্রষ্টার হাতের পুতুল বিবেচনাকারী মতবাদ) এবং কাদরিয়া (মানুষকে পুরোপুরি স্বাধীন ও সক্ষম বিবেচনাকারী মতবাদ) সংক্রান্ত বিতর্কও বেশ উগ্রভাবাপন্ন। এ কথা সত্য যে, তাত্ত্বিকভাবে এ বিষয়ে ঈমান ও যুক্তির উভয় পাল্লায় ভারসাম্য রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু তাই বলে এটা যেমন আছে তেমন থাকতে দেওয়াও সঙ্গত নয়। যদিও আমার মতে অদৃষ্টে বিশ্বাস ঈমানের অংগীভূত নয় বরং এটা নিছক একটা ধর্মীয় বিধির চেয়ে বেশী কিছু নয়, কিন্তু কুরআনের আয়াতে প্রশ্নকারীদের দৃষ্টিতে বাহ্যত: স্ববিরোধিতা পরিদৃষ্ট হয় বিধায় এ সমস্যা নিয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন রয়েছে।

সমস্যাটা যদিও অত্যন্ত পুরনো এবং এ নিয়ে লিখিতভাবে আমাদের হাতে বহু উপাদান রয়েছে, কিন্তু নানা মুনির নানা মতে জর্জরিত এ যুগে বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রমাণ সহকারে এ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন।

পুস্তিকাটি যদিও প্রথমত: উপরোক্ত চিঠির জবাবেই লেখা হয়েছিল এবং এটা লেখার মূল উদ্দেশ্য ছিল কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের মধ্যে আপাতঃ দৃশ্যমান বিরোধ ও বৈপরীত্য নিরসন করা। কিন্তু এতে প্রাসঙ্গিকভাবে যেসব তত্ত্ব ও তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে, তা তাকদীর সমস্যা সমাধানে সবিশেষ সহায়ক হতে পারে। দর্শন, নৈতিক বিধান, সমাজ বিজ্ঞান ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় যারা অদৃষ্টবাদ সংক্রান্ত জটিলতায় দিশেহারা হয়ে পড়েন, তাদের সকলের জন্য এ পুস্তিকা সমাধানের দিকনির্দেশক হবে বলে আশা করা যায়। এই উপকারিতা ও স্বার্থকতার দিকটি বিবেচনা করেই একে পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। এই সমস্যার অধিকতর বিশ্লেষণ সম্বলিত আমার অন্য একটা প্রবন্ধও এ পুস্তিকার শেষভাগে পরিশিষ্ট হিসেবেসংযোজিতহয়েছে।

আবুল আ'লা মওদুদী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

তাকদীর সমস্যার নিগূঢ় রহস্য

তাকদীর সংক্রান্ত কুরআনী আয়াতগুলোতে বাহ্যতঃ যে বৈপরীত্য দেখা যায়, সেই বৈপরীত্য নিরসন করে আয়াতগুলোতে সমন্বয় সাধন করলেই তা উত্থাপিত প্রশ্নের জবাবের জন্য যথেষ্ট হ'তে পারে। কিন্তু এই সমন্বয় সাধনের ব্যাপারে এমন অনেকগুলো বিষয়ের অবতারণা করা অপরিহার্য হ'য়ে পড়ে, যা একটু বিশদভাবে বিশ্লেষণ না করলে মূল বক্তব্য বুঝা কঠিন হবে। এজন্য কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলো নিয়ে আলোচনা করার আগে তাকদীর বা অদৃষ্ট তত্ত্বের গোড়ার কথা এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের ওপর নজর বুলিয়ে নেয়া সমীচীন বলে মনে হয়।

স্বাধীনতা ও অধীনতার প্রাথমিক প্রভাব

কোন চিন্তা-গবেষণা ছাড়াই এবং নিছক স্বতস্ফূর্ত ও প্রাথমিক বুদ্ধি বিবেচনা থেকেই যে কোন মানুষ এ ধারণা পোষণ করে থাকে যে, মানুষ মাত্রেই স্বীয় ইচ্ছাকৃত কাজ-কর্মে স্বাধীন। যে কাজ সে আপন ইচ্ছায় করে, তার জন্য সে দায়ী এবং জবাবদিহী করতে বাধ্য। ভালো কাজের জন্য সে প্রশংসা ও পুরস্কারের যোগ্য, আর মন্দ কাজের জন্য শাস্তি ও ধিক্কার পাওয়ার উপযুক্ত। এই সহজ সরল ও স্বতস্ফূর্ত ধারণার কোথাও এরূপ চিন্তার অবকাশ মাত্র থাকেনা যে, মানুষ যে কাজ ভেবে-চিন্তে ও জেনে-বুঝে করে, তা সে বাইরের বা ভেতরের কোন শক্তির চাপে বাধ্য হয়ে করে। যেখানে যথার্থই বাধ্য হওয়া ও বশীভূত হওয়ার লক্ষণ দেখা যায়, সেখানে কাজটাকে জবরদস্তিমূলক ও অনিচ্ছাকৃতই বলা হয়, ইচ্ছাকৃত ও স্বাধীনভাবে কৃত বলা হয়না। সে ক্ষেত্রে মানুষের দায়দায়িত্ব ও জবাবদিহীর প্রশ্নও আর থাকেনা, প্রশংসা কিংবা তিরস্কার এবং শাস্তি বা পুরস্কারের উপযোগিতাও অবশিষ্ট থাকেনা। আর এ ধরনের অবস্থায় মানুষকে ভালো বা মন্দ, সৎ বা অসৎ

বলারও প্রশ্ন ওঠেনা। কেউ যদি কাউকে লক্ষ্য করে ঢিল ছোঁড়ে কিংবা গালি দেয়, তবে তার মনে এ কল্পনারও উদয় হয়না যে, ঐ ব্যক্তি এ কাজ অপর কোন শক্তির চাপে বাধ্য হয়ে করেছে। এজন্যই সে ঐ ব্যক্তিকে এ অপকর্মের জন্য দায়ী মনে করে তাকে পাল্টা গালি দেয় কিংবা ঢিল ছোঁড়ে। কিন্তু ঐ লোকটিই যদি উন্মাদ হয় তবে তার ঢিল ছোঁড়া বা গালি দেওয়াকে কেউ ইচ্ছাকৃত অপরাধ মনে করেনা, বরং তাকে অচেতন ও অসহায় সাব্যস্ত করে তাকে তার কাজের দায়দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। বে-এখতিয়ার, অনিচ্ছাকৃত কাজ এবং ইচ্ছাকৃত ও স্বাধীনভাবে করা কাজের মধ্যকার এ পার্থক্য আমাদের কাছে আগে থেকেই সুপরিচিত। আমরা মানুষের সৎ ও অসৎ হওয়া এবং শাস্তি বা পুরস্কারযোগ্য হওয়ার জন্য যে মানদন্ড নির্ধারণ করেছি, এ পার্থক্যই তার ভিত্তি। একটি শিশু বা পাগল উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়ালে তাকে আমরা কখনো ভর্ৎসনা করিনা। তবে একজন সুস্থ ও বুদ্ধিমান প্রাপ্তবয়স্ক লোক যদি নগ্ন অবস্থায় বাইরে আসে তাহলে তাকে আমরা ঘৃণার চোখে দেখি। কারোর চেহারা যদি জন্মগতভাবেই কদাকার হয় তবে তা দেখে কেউ মন খারাপ করেনা। কিন্তু সুশ্রী চেহারাধারী মানুষ যদি আমাদেরকে দেখে মুখ ভ্যাংচায়, তাহলে আমাদের খারাপ লাগে। জ্বরের রোগী যদি অচেতন অবস্থায় আবোল তাবোল বকে, তবে আমরা তাকে দোষ দেইনা। কিন্তু সচেতন অবস্থায় কেউ আজেবাজে বকলে তাকে ভীষণভাবে তিরস্কার করা হয়। একজন অন্ধ যদি নিজের জিনিসের বদলে অন্যের জিনিস তুলে নেয় তবে আমরা তাকে চুরির দায়ে অভিযুক্ত করিনা। কিন্তু চক্ষুষ্পান ব্যক্তি এ কাজ করলে তাকে তৎক্ষণাৎ পাকড়াও করা হয়। কেউ যদি কোন চাপের মুখে সৎ কাজ করে তবে তার প্রশংসা করা হয়না। কিন্তু বিনা চাপে যে সৎ কাজ করে তার প্রশংসায় সবাই পঞ্চমুখ হয়ে থাকে। শিশু পাপ কাজ না করায় তাকে সৎ লোক বলা হয়না। তবে কোন যুবক পূণ্য কর্ম করলে তাকে নেককার বলা হয়। এ সবের কারণ এই যে, বাহ্যিক অবস্থা দেখে আমরা আগে থেকেই বুঝতে পারি যে, মানুষ কতক কাজে স্বাধীন এবং কতক কাজে বাধ্য। আর আমরা বুঝে-সুজেই এ মত পোষণ করে থাকি যে, বাধ্য হয়ে যে কাজ করা হয় তার জন্য নয় বরং স্বেচ্ছায় ও স্বাধীনভাবে যে কাজ করা হয় তার জন্যই মানুষকে দায়ী ও জবাবদিহী করতে বাধ্য করা হয় এবং তার ভিত্তিতেই প্রশংসা ও ধিক্কার, শাস্তি ও পুরস্কারের যোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়।

তাকদীর সমস্যার গোড়ার কথা

কিন্তু মানুষ যখন চিন্তা–গবেষণা চালিয়ে বস্তুর বাহ্যিক রূপের আড়ালে লুকানো রহস্য অন্বেষণ করে তখন তার কাছে এ সত্য উদঘাটিত হয় যে, বাহ্যতঃ সে নিজেকে যতখানি স্বাধীন ও সক্ষম মনে করে, আসলে সে ততটা নয়। আর আপাতঃদৃষ্টিতে সে নিজের অধীনতা ও বাধ্যবাধকতার যে সীমানা চিহ্নিত করে, আসলে তা তার চেয়ে অনেক বেশী প্রশস্ত ও বিস্তৃত। এটাই হলো অদৃষ্ট তত্ত্বের সূচনাবিন্দু। এ তত্ত্বের ভিত্তি নিম্নোক্ত প্রশ্নাবলীর ওপর প্রতিষ্ঠিতঃ

(১) মানুষ কি তার কার্যকলাপে একেবারেই বাধ্য ও অধীন, না কিছুটা স্বাধীনতার অধিকারী?

(২) যে শক্তি মানুষকে বাধ্য করে কিংবা তার স্বাধীনতাকে সংকুচিত ও শৃংখলিত করে, তা কোন্ শক্তি? মানুষের জীবনের ওপর সেই শক্তির প্রভাব কতটুকু?

(৩) মানুষ যদি সম্পূর্ণ বাধ্য ও শৃংখলিত হয়ে থাকে, তাহলে কাজের দায়দায়িত্ব ও জবাবদিহী এবং কাজের জন্য প্রশংসা ও তিরস্কার বা পুরস্কার ও শাস্তি সংক্রান্ত নিয়মবিধি যা আমাদের নৈতিক ধ্যান–ধারণার ভিত্তি এবং যার ওপর আমাদের সামাজিক জীবনের বিশুদ্ধতা ও কল্যাণ নির্ভরশীল, কিসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে?

পৃথিবীর চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ এসব প্রশ্ন নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা–ভাবনা করেছেন। তারা এগুলোর সমাধানের বিভিন্ন পথ উদ্ভাবন করেছেন এবং বিভিন্ন সাক্ষ্য–প্রমাণের আলোকে নানা রকমের মতবাদ রচনা করেছেন। এ বিষয়ে পন্ডিত ও গবেষকদের নিবন্ধমালা ও মতভেদ এত বেশী যে, তা বলে শেষ করা সহজ নয়। তবে মৌলিকভাবে আমরা এগুলোকে চার ভাগে ভাগ করবো।

(১) অতি প্রাকৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা (২) প্রাকৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা (৩) নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার–বিবেচনা (৪) ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেনিরীক্ষণ।

এবার আসুন, এইসব বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিভিন্ন গোষ্ঠী কিভাবে এ সমস্যা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছে, আলোচনা ও যুক্তি-বিশ্লেষণের কোন্ কোন্ প্রণালী অবলম্বন করেছে এবং সর্বশেষে কোন্ কোন্ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে, সেটা পর্যালোচনা করে দেখি।

অতি প্রাকৃতিক দৃষ্টিকোণ

অতি প্রাকৃতিক মতবাদগুলোতে (Metaphysics) অদৃষ্ট বা তাকদীরের ব্যাপারটা দুইদিক থেকে বিবেচনায় আসেঃ

প্রথমতঃ সক্ষমতা বলতে আমরা এই বুঝি যে, কর্তা এমন এক সত্তা হবে যা দ্বারা কাজ সংঘটিত হওয়া এবং না হওয়া দুটোই সম্ভব। অন্য কথায়, সে এরূপ স্বাধীন যে, ইচ্ছা করলে কাজ করতে পারে, ইচ্ছা না করলে নাও করতে পারে। সক্ষমতার এই সংজ্ঞা মেনে নেওয়ার পর প্রশ্ন ওঠে যে, কাজ করার চেয়ে না করার অগ্রাধিকার কেন? এই ক্ষমতার নিষ্ক্রিয় অবস্থা থেকে সক্রিয় অবস্থায় উত্তির্ণ হওয়ার কোন কারণ থাকে না, ওটা বিনা কারণেই হয়ে থাকে? যদি বিনা কারণে হয়, তাহলে তো অহেতুক ও অযৌতিকভাবে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং বিনা কারণে কাজ সংঘটিত হওয়া অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়। অথচ এটা বুদ্ধির অগম্য ব্যাপার। আর যদি তার জন্য কোন কারণ বা অগ্রাধিকারের হেতু থাকা জরুরী হয়ে থাকে তাহলে সেই জিনিসটা কি? এ প্রশ্নের জবাবে জাবরিয়া বা অধীনতাবাদীরা বলে যে, জিনিসটা হচ্ছে এমন সব উপকরণ, যা মানুষের নিয়ন্ত্রণে নেই বরং এক অতি প্রাকৃতিক শক্তির হাতে রয়েছে, যাকে খোদাও বলা যায়, নতুবা সকল উপকরণের স্রষ্টা ও বিধাতা, সকল কারণের মূল কারণ অথবা প্রাকৃতিক নিয়ম ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করা যায়। পক্ষান্তরে স্বাধীনতাবাদীরা (কাদরিয়া) বলে যে, সে জিনিসটা মানুষের নিজের ইচ্ছা ছাড়া আর কিছু নয়। অধীনতাবাদীদের বক্তব্য অনুসারে যাবতীয় কল্যাণ ও অকল্যাণের উৎস একমাত্র খোদার সত্তাকে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় থাকেনা। এই মতানুসারে মানুষকে নিরেট জড় পদার্থ বা উদ্ভিদের মত অচল-অক্ষম ও দায়-

তাতো প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আল্লাহর সাথে মানুষের ক্ষমতার সামঞ্জস্য বিধান করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। অনুরূপভাবে আল্লাহর সর্বজ্ঞ ও নিরংকুশ ইচ্ছা শক্তির অধিকারী হওয়াতে মানুষের ভালো বা মন্দ কাজ–কর্ম করা যেরূপ বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে, তাতে মানুষের স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ন রাখা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। স্বাধীনতাবাদীরা তথা কাদ্‌রিয়া গোষ্ঠী এ আপত্তি থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য যেসব পথ অবলম্বন করেছে তার বেশীর ভাগ আরো মারাত্মক প্রশ্নের জন্ম দেয়। তারা জাবরিয়া গোষ্ঠীর কাছে যেসব আপত্তি উথাপন করে, এগুলো তারচেয়েও খারাপ। যেমন তাদের কেউ কেউ আল্লাহর সর্বজ্ঞ ও নিরংকুশ ইচ্ছার অধিকারী হওয়ার কথা একেবারেই অস্বীকার করেছেন। কেউ কেউ আল্লাহর সর্বজ্ঞতা ও ইচ্ছা শক্তির অস্তিত্ব মেনে নিলেও খুটিনাটি ব্যাপারে তিনি অবগত নন বরং শুধু মৌলিক বিষয়ে অবগত বলে বিশ্বাস করেনা। কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ মানুষকে যেসব ক্ষমতা দান করেছেন তা দ্বারা তিনি কেবল ভালো ও কল্যাণের ইচ্ছা পোষণ করতেন এবং এসব ক্ষমতার যে অপব্যবহার করা হবে তা তিনি জানতেন না। কিন্তু এসব বক্তব্য এত দুর্বল যে, এগুলোকে ভ্রান্ত প্রমাণ করতে খুব বেশী চিন্তা–ভাবনার দরকার হয়না। জাবরিয়া তথা অধীনতাবাদীদের জবাবে স্বাধীনতাবাদীরা সবচেয়ে বলিষ্ঠ যে যুক্তি দিয়েছে, সেটা এই যে, আল্লাহর আগাম জ্ঞান ও মানুষের স্বাধীনতার মধ্যে বাহ্যতঃ যতই বৈপরীত্য দেখা যাক না কেন, প্রকৃতপক্ষে ভবিষ্যতের কোন ঘটনা সম্পর্কে কারোর নির্ভুল জ্ঞান থাকার অর্থ এটা নয় যে, ঐ জ্ঞানই ঘটনাটি ঘটিয়েছে। আমরা যদি আবহাওয়া সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করি যে অমুক সময়ে বৃষ্টি হবে এবং সে ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হয়, তাহলে এ কথা বলা চলেনা যে বৃষ্টির কথা আমরা জেনেছিলাম বলেই তা হয়েছে। কিন্তু এ যুক্তি যত বলিষ্ঠ মনে হয়, আসলে তত বলিষ্ঠ নয়। কেননা নির্ভুল আগাম জ্ঞান এবং আগাম ধারণা এক কথা নয়। অনুমিত ঘটনা ঘটে যাওয়ার ব্যাপারে পূর্বাহ্নের ধারণা ও অনুমানের কোন হাত থাকেনা এটা নিঃসন্দেহে সত্য। কিন্তু ভবিষ্যতের যে ব্যাপারটা নির্ভুলভাবে আগাম জানা যায় তারসাথে ঐ জ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক নেই এমন কথা বলা খুবই কঠিন।

এই কটি মৌলিক আপত্তি ছাড়া আরো কয়েকটি খুটিনাটি আপত্তি রয়েছে। প্রাকৃতিক মতবাদগুলোতে অধীনতাবাদ ও স্বাধীনতাবাদ উভয়ই এইসব

অক্ষম ও দায়–দায়িত্বহীন বলে স্বীকার করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। আর স্বাধীনতাবাদীদের বক্তব্য অনুসারে এ কথা শীরোধার্য মেনে নিতে হয় যে, মানুষের ইচ্ছা আল্লাহর সৃষ্টি জগতের বাইরের এক বস্তু। এতে করে আল্লাহ ছাড়া বিশ্বজগতে এমন একটা জিনিসের অস্তিত্বও সত্য বলে মেনে নিতে হয়, যা কারোর সৃষ্টি নয়। কেননা মানুষের ইচ্ছার স্রষ্টা যদি আল্লাহ না হয়ে থাকেন, তবে স্বয়ং মানুষও তার স্রষ্টা হতে পারেনা। কারণ মানুষ নিজেই আল্লাহর সৃষ্টি। কাজেই এ ক্ষেত্রে মেনে নিতে বাধ্য হতে হয় যে, একটি সৃষ্টি জীবের ইচ্ছা কারোর সৃষ্টি নয়। অথচ এটা একেবারেই একটা অগ্রহণযোগ্য কথা।

দ্বিতীয়তঃ যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণাদি দ্বারা এ কথা সত্য বলে সাব্যস্ত হয়েছে যে, বিশ্ব স্রষ্টার সর্বজ্ঞ হওয়া ও নিরংকুশ ইচ্ছাশক্তির অধিকারী হওয়া অপরিহার্য। কেননা স্রষ্টা যা সৃষ্টি করবেন আর সম্পর্কে যদি জ্ঞাত না থাকেন এবং সৃষ্টি করার ইচ্ছা না করেন, তাহলে তিনি স্রষ্টা হতেই পারেন না। এই মূলনীতি অনুযায়ী এটা স্বীকার করা অনিবার্য যে, সৃষ্টি জগতে যা কিছু হচ্ছে, তার সবই স্রষ্টার আগে থেকেই জানা ছিল এবং তিনি ইচ্ছাও করেছিলেন যে, তা হোক। এখন অমুক ব্যক্তি অমুক সময়ে অমুক কাজ করবে, এটা যদি স্রষ্টার জানা থেকে থাকে, তাহলে ঐ কাজটির ঐ সময়ে ঐ ব্যক্তি দ্বারা সংঘটিত হওয়া অবধারিত। তা যদি না হয়, তাহলে স্রষ্টার অজ্ঞতা প্রমাণিত হয়, যা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে আল্লাহ যদি এরূপ ইচ্ছা করে থাকেন যে, অমুক সময়ে অমুক ব্যক্তি দ্বারা অমুক কাজ হোক, তাহলে তাঁর সে ইচ্ছা পূর্ণ হওয়া অপরিহার্য। নচেত প্রমাণিত হবে যে, তাঁর ইচ্ছা নিষ্ফল। এই যুক্তি দ্বারা অধীনতাবাদীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, স্বাধীন কাজ করার ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া আর কারোর নেই। বাদ বাকী যত স্বাধীন সৃষ্টি রয়েছে তারা শুধু দেখতেই স্বাধীন, আসলে অধীন ও অক্ষম। স্বাধীনতাবাদীরা এ ক্ষেত্রেও ঐ একই আপত্তি তোলেন যে, এতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ ভালো মন্দ উভয় কর্মের কর্তা এবং মানুষের সমস্ত কাজ–কর্মের দায়–দায়িত্ব আল্লাহর ওপর আরোপিত হয়। এ হিসাবে পশু, জড় পদার্থ ও উদ্ভিদের সাথে মানুষের কোন পার্থক্য থাকেনা।

কিন্তু এ আপত্তিতে যতখানি ভারত্ব আছে তারচেয়েও বেশী ভারত্ব রয়েছে আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছা সম্পর্কে জাবরিয়া বা অধীনতাবাদীরা যে আপত্তি তুলেছে

আপত্তির সম্মুখীন হয়ে থাকে। তবে উভয়ের সমস্যাবলী এক রকম নয়। এ কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, মানুষকে নিরেট জড় পদার্থের মত অক্ষম ধারণা করার মতবাদ (জাবরিয়াত) মানুষের স্বাধীনতা হরণ করে এমন একটা বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করেছে, যার প্রমাণ আমরা আমাদের সত্তার মধ্যে প্রাথমিকভাবে এবং স্বতস্ফূর্ত উপলব্ধি থেকেই পাই। কিন্তু স্বাধীনতাবাদ যে পথ অবলম্বন করেছে, সেটা তো এরচেয়েও নিকৃষ্ট। কেননা এই মতবাদ আল্লাহর সর্বজ্ঞতা, সর্বশক্তিমত্তা এবং নিরংকুশ ইচ্ছাশক্তিকে হরণ করে মানুষকে এসব গুণের অধিকারী বলে বিবেচনা করে, অথবা একেবারে খোদা বা বিশ্ব স্রষ্টার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে। আর এই উভয় ক্ষেত্রে এমন সব অসম্ভব ব্যাপারকে সম্ভব মানতে হয়, যা মেনে নেওয়া দর্শন ও তর্কশাস্ত্রীয় রীতিতে চিরন্তন ও ইন্দ্রিয়ানুভূত সত্যকে অস্বীকার করার চেয়েও নিকৃষ্ট কাজ। এজন্যই অতি প্রাকৃতিক দর্শন পরিমন্ডলে স্বাধীনতাবাদ শিকড় গাড়ার কোন মজবুত ভিত পায়নি। মুষ্টিমেয় কিছু নাস্তিক ছাড়া দার্শনিকদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মানুষকে অক্ষম ও অধীনই ভেবেছেন। প্রাচীন দার্শনিকদের মধ্যে এ্যানোক্সিমান্ডার (Aneximander) প্লেটো এবং রাওয়াকী (Stoieks) গোষ্ঠী এই মতবাদের সমর্থক ছিলেন। সবচেয়ে বড় মুসলিম দার্শনিক ইবনে সীনা স্বীয় গ্রন্থ তা'লিকাতে শেফা'তে লিখেছেনঃ

"প্রচলিত পরিভাষায় স্বাধীন বলতে বুঝায় সম্ভাব্য স্বাধীন–কার্যতাঃ স্বাধীন নয়। আর যে সম্ভাব্য স্বাধীন, সে কার্যতঃ স্বাধীন হওয়ার জন্য একটি সহায়ক উপাদানের মুখাপেক্ষী। সেই সহায়ক উপাদান তার নিজ সত্তার ভেতরে থাক বা বাইরে থাক তাতে কিছু আসে যায়না। কাজেই আমাদের মধ্যে যারা স্বাধীন, প্রকৃত পক্ষে তারা অক্ষম ও অধীন।"

ইউরোপীয় দার্শনিকদের অবস্থাও তদ্রুপ। পম্পোনাজী (Pomponazze) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন যে, ভালো–মন্দের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। তাই বিবেকের সর্বাত্মক ফায়সালা এই যে, মানুষ স্বাধীন নয়। হব্‌স (Hobbes) বলেনঃ মানুষ নিজের স্বভাব ও সহজাত প্রবৃত্তির হাতে পুরোপুরি বন্দী ও বাধ্যগত। ডেকার্টে (Descarte) যিনি মন ও দেহকে অথবা আত্মা ও বস্তুকে সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা জিনিস মনে করেন, তিনি বস্তুজগতের সর্বত্র কেবল অক্ষমতা ও অধীনতাই

ক্রিয়াশীল দেখতে পান। তাঁর মতে মানুষসহ সমগ্র বিশ্ব যন্ত্রের মত বশীভূত হয়ে কাজ করছে। যদিও সেই সাথে তিনি প্রাণকে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীন ক্ষমতাবান সত্তা হিসেবে মানেন। কিন্তু তাঁর দর্শনের যৌক্তিক ফল অক্ষমতা ও বশ্যতাতেই গিয়ে ঠেকে। কার্টেজীর মতবাদের (Cartesian School) প্রবক্তাদের মধ্যে ম্যালেব্রাঁ (Malebbranehe) সবচেয়ে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। তিনি এবং তাঁর সমমতাবলম্বীরা সুস্পষ্টভাবে বলেন যে, স্রষ্টা মনের প্রতিটি ইচ্ছার সাথে সাথে দেহে গতি ও চাঞ্চল্যের সঞ্চার করেন। দেহের প্রতিটি চাঞ্চল্যের সঙ্গে সঙ্গে মনে চেতনা ও উপলব্ধির সৃষ্টি করেন। বস্তু ও আত্মার মধ্যে অথবা চিন্তার বিস্তৃতির মধ্যে আল্লাহর মধ্যস্থতা অপরিহার্য। কেননা একটা মাধ্যম ছাড়া এই দুটো পৃথক উপাদানের মধ্যে পারস্পরিক আদান প্রদান অকল্পনীয়। সুতরাং আল্লহই যাবতীয় ইচ্ছা ও তৎপরতার প্রকৃত স্রষ্টা। স্পাইনোজ (Spinoz) -এর মতে মানুষ আপন সত্তার মধ্যে যতই সক্রিয়তা অনুভব করুক না কেন, আসলে সে স্বয়ংক্রিয় নয়। বরং অন্যের দ্বারা সঞ্চালিত। তাই সে একেবারেই ক্ষমতাহীন। তাঁর মতে এই অক্ষমতা ও অধীনতাই একজন দার্শনিকের মনের শান্তি ও আনন্দের উৎস। লেইবনিট্জ (Leibnitz)-এর কথিত ব্যক্তিসত্তাগুলো (Monads) যদিও মূলতঃ স্বাধীন, কিন্তু তাদের মধ্যে যে পারস্পরিক সৌহার্দ আদিম কাল থেকে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে সেটা আল্লাহর সৃজিত। এভাবে তিনিও চূড়ান্ত পর্যায়ে অধীনতাবাদের দিকেই চলে আসেন। বলতে গেলে, লেইবনিট্জের মতবাদেই আসল ও নির্ভেজাল অধীনতাবাদ বিদ্যমান। লক্ (Locke) ইচ্ছার স্বাধীনতাকে নিরর্থক এবং ডেকার্টের দর্শনে যে স্বাধীনতাবাদের বক্তব্য পাওয়া যায় তাকে ভ্রান্ত বলেন। তিনি যদিও স্পষ্টভাবে অধীনতার স্বীকৃতি দেননা, কিন্তু তিনি যখন বলেন যে, আমরা ইচ্ছা করার ব্যাপারে স্বাধীন নই, ইচ্ছা নির্ধারিতহয় মন থেকে এবং মন কি ইচ্ছা করবে তা নির্ণিত হয় তার আনন্দ ও কামনা বাসনা থেকে, তখন তাঁর দর্শন স্বাধীনতাবাদ থেকে অধীনতাবাদের দিকে মোড় নেয়। সপেনহা (Schopenhanre) মানুষ থেকে শুরু করে জড় পদার্থ পর্যন্ত সকল বস্তুতে যে ইচ্ছার উপস্থিতি দেখতে পান, সেটা সেই ইচ্ছা নয় যার স্বাধীনতার ওপর স্বাধীনতাবাদ তথা কাদরিয়াতের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

এ কথা সত্য যে, কেন্ট (Kant) ফিষ্টে (Fichlte) এবং হেগেলের মত বড় বড় দার্শনিকরা স্বাধীনতাবাদের দিকে ঝোঁক প্রকাশ করেছেন। সক্রেটিস ইচ্ছার

স্বাধীনতা এবং প্লেটো মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ ও নিবারণ ক্ষমতা সমর্থন করেছেন। এরিষ্টোটল ইচ্ছাকৃত ও বাধ্যতামূলক কাজে পার্থক্য দেখিয়ে মানুষকে কিছুটা স্বাধীন এবং কিছুটা অধীন বলে আখ্যায়িত করেছেন। ক্রেসীপাস (Chrxsippus) অধীনতাবাদ ও নৈতিক দায়দায়িত্বের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। মুসলিম দার্শনিকদের একটি দল বলেছেন "স্বাধীনতাও নয় অধীনতাও, নয় মধ্যবর্তী একটা অবস্থা।" কিন্তু এসব মতবাদ বাস্তব কৌশলের খাতিরে প্রণীত– তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের খাতিরে নয়। নচেত নিরেট অতি প্রাকৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে অধীনতাবাদের পাল্লা স্বাধীনতাবাদের তুলনায় অনেক বেশী ভারী। দার্শনিকদের যা কিছু মতভেদ হয়েছে, তা প্রধানতঃ জাবরিয়াত (অধীনতাবাদ) বনাম কাদরিয়াত (স্বাধীনতাবাদ) নিয়ে হয়নি বরং চরম জাবরিয়াত ও মধ্যম জাবরিয়াত নিয়ে হয়েছে।

দর্শনের ব্যর্থতা

কিন্তু এ আলোচনায় স্বাধীনতাবাদের তুলনায় অধীনতাবাদের পাল্লা ভারী হয়ে যাওয়ায় এ কথা প্রমাণিত হয়না যে, দর্শন এই জটিল সমস্যার সমাধান করে ফেলেছে এবং অধীনতাবাদের পক্ষে নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। বরং এ দ্বারা শুধু এটাই প্রমাণিত হয় যে, মানুষ যখন মহাবিশ্বের পরিচালনা ব্যবস্থা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে এবং এই পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে এমন দোর্দন্ড ব্যবস্থার পরিচালকের গুণাবলীর কল্পনা করে, তখন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তার মন–মগজে এমন ভীতিবিহবল ভাব ছড়িয়ে পড়ে যে, তার দৃষ্টিতে তার নিজের সত্তারও কানাকড়ি মূল্য থাকেনা। তার বিস্ময়বিমূঢ় বিবেক তাকে বলে যে, যার সীমাহীন ক্ষমতা এই কূল–কিনারাহীন বিশ্বজগতকে আপন মুঠোর মধ্যে ধরে রেখেছে, যার ইচ্ছা শক্তি এত বড় বিশাল সাম্রাজ্যের ওপর শাসন চালাচ্ছে এবং যার জ্ঞান এই মহাবিশ্বের ছোট বড় প্রতিটি জিনিসের অস্তিত্ব ও গতিবিধিকে অনাদি অনন্তকাল ধরে নিয়ন্ত্রণ করছে, তার সামনে তুমি একেবারেই অক্ষম ও অসহায়। তোমার শক্তি, তোমার জ্ঞান এবং তোমার ইচ্ছা তার সামনে কিছুই নয়।

এরচেয়ে সামনে অগ্রসর হয়ে কেউ যদি মনে করে যে, দর্শন অদৃষ্টের সমস্যাকে বুঝে ফেলেছে, তাহলে সে চরম ভ্রান্তিতে লিপ্ত। তাকদীরের প্রশ্ন মূলতঃ

এটাই যে, আল্লাহর এই বিশ্ব সাম্রাজ্য পরিচালনার মূলনীতি কি? আল্লাহর জ্ঞান ও এই জ্ঞানের আওতাধীন বস্তুনিচয়, তাঁর শক্তি–সামর্থ্য ও তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন জিনিস সমূহ এবং তাঁর ইচ্ছাশক্তি ও ইচ্ছাহীন সৃষ্টির মধ্যে সম্পর্কটা কি ধরনের? আল্লাহর আদেশের অর্থ কি? কিভাবে তা তাঁর সৃষ্টি জগতে কার্যকর হয়? সৃষ্টির শ্রেণীভেদে তাঁর আদেশ কোন্ কোন্ বিধি অনুসারে বাস্তবায়িত হয়? বিশ্বজগতে বিরাজমান অসংখ্য প্রকারের সৃষ্টির মধ্যে কোন্ সৃষ্টি কোন্ পর্যায়ে তাঁর আজ্ঞাবহ? এখন কেউ যদি দাবী করে যে, সে এ সকল প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছে, তাহলে তার দাবীর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, সে খোদাকে ও তাঁর গোটা সাম্রাজ্যকে পরিমাপ করে ফেলেছে। কাদরিয়া ও জাবরিয়া গোষ্ঠীদ্বয় পরস্পরের ওপর যে ধরনের দোষারোপ করে থাকে, এ দাবী তারচেয়েও নিকৃষ্ট ধরনের। আর যদি এ ধরনের দাবী না করা হয় তাহলে নিছক যুক্তি ও অনুমানের ওপর নির্ভর করে নিশ্চিত জ্ঞান ও প্রত্যয়ের এমন স্তরে উপনীত হওয়া কিভাবে সম্ভব–যেখানে নির্ভুলভাবে অধীনতা বা স্বাধীনতার যে কোন একটার পক্ষে রায় দেওয়া সম্ভব হতে পারে?

বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ (Physics)

বস্তুবাদী এ বিষয়টা এভাবে আলোচ্যসূচীতে স্থান পায় যে, অন্য সকল সৃষ্টির ন্যায় মানুষের কার্যকলাপও প্রাকৃতিক উপায়–উপকরণের আওতাভুক্ত। মানুষ যা কিছুই করে, কোন এক বা একাধিক উপকরণের প্রভাবেই তা করে। একটা কাজ সংঘটিত হওয়ার জন্য যেসব উপকরণের প্রয়োজন, তা যদি একত্রিত না হয়, তাহলে কাজটা সংঘটিত হতে পারে না। আর যদি একত্রিত হয় তাহলে কাজটা সংঘটিত না হয়েই পারে না। এই উভয় ক্ষেত্রে মানুষ একেবারেই অক্ষম ও অসহায়। এদিক থেকে বস্তুবাদী দর্শন সব সময় মানুষের অক্ষমতা ও অধীনতারই পক্ষপাতী। বস্তুবাদের প্রাচীনতম দার্শনিক ডেমোক্রিটিস (Democritees) এখন থেকে আড়াই হাজার বছর আগে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে গেছেন যে, বিশ্বের সকল জিনিস প্রাকৃতিক নিয়মের অটুট নিগড়ে আবদ্ধ।

তথাপি যতদিন পর্যন্ত প্রকৃতিবাদীরা আত্মা ও বস্তুর মৌলিক পার্থক্যকে অস্বীকার করেনি, মনস্তাত্মিক শক্তিগুলোকে যতদিন তারা বস্তুজগতের অন্ততঃ কিছুটা বাইরের জিনিস মনে করতো, ততদিন স্বাধীনতাবাদের জন্য প্রকৃতি দর্শনে কিছু না কিছু অবকাশ ছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনাকালে যখন প্রকৃতিবিদ্যার অস্বাভাবিক উন্নতি সাধিত হলো এবং বিজ্ঞানের জগতে নতুন নতুন আবিষ্কার উদ্ভাবনের দ্বারোদঘটিন হতে লাগলো, তখন মানবাত্মা ও মন এবং তার যাবতীয় শক্তি–সামর্থ বস্তুগত বিন্যাস এবং বস্তুর রাসায়নিক মিশ্রণ প্রকিয়ার ফল বলে আখ্যায়িত হলো এবং মানুষকে একটা আত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক সত্তার পরিবর্তে নিছক একটি যান্ত্রিক সত্তা হিসেবে গণ্য করা হলো। এভাবে স্বাধীনতাবাদকে প্রকৃতি দর্শনের পরিমন্ডল থেকে ঝেটিয়ে বিদায় করা হলো এবং বিজ্ঞান পুরোপুরিভাবে জাবরিয়াত তথা অধীনতাবাদকে সমর্থন দিয়ে বসলো।

জীববিদ্যা (Biology) এবং শরীরবিদ্যা (Physiology) সংক্রান্ত আধুনিক গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধানের ফলে মনস্তত্ত্ব এখন বলতে গেলে এই দুটো বিদ্যারই

অন্যতম শাখায় পরিণত হয়েছে। এসব গবেষণা থেকে এ তথ্যও জানা যাচ্ছে যে, মগজের আকৃতি, তার গঠন এবং মগজকোষ ও স্নায়ুতন্ত্রীর প্রকৃতির ওপরই মানুষের আসল স্বভাব নির্ণয় নির্ভরশীল। এটা খারাপ হয়ে গেলে মানুষের স্বভাবও বিকৃত হয় এবং তার দ্বারা খারাপ কাজ ও খারাপ প্রবণতা প্রকাশ পায়। আর এটা ভালো হলে তার স্বভাবও ভালো হয় এবং উত্তম প্রবণতা ও উত্তম কার্যকলাপ সংঘটিত হয়। এখন মগজ কোষ ও স্নায়ুতন্ত্রী গঠনে যখন মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার কোন হাত নেই তখন এই বস্তুবাদী মতবাদ মেনে নেওয়ার পর এ কথা না মেনে উপায় থাকে না যে, মানুষের ভেতরে স্বাধীনতা নামক কোন উপাদানই নেই। লোহার যন্ত্র যেমন একটা ধরাবাধা নিয়মে কাজ করে, তেমনি মানুষও প্রাকৃতিক নিয়মের এক দুর্লংঘ বিধি অনুসারে কাজ করছে। নৈতিকতার ভাষায় যে জিনিসকে আমরা পুণ্যকর্ম ও সদাচার বলে আখ্যায়িত করে থাকি, বিজ্ঞানের ভাষায় তা নিছক শারীরিক উপাদান সমূহের নিখুঁত বিন্যাস এবং স্নায়ুতন্ত্রীর সুস্থতারই নামান্তর। নৈতিকতা যাকে অনাচার ও খারাপ চালচলন বলে আখ্যায়িত করে, বিজ্ঞান তাকে মগজ কোষ ও স্নায়ুতন্ত্রীর অসুস্থতা নামে অভিহিত করে। এদিক থেকে পূণ্যকর্ম ও শারীরিক সুস্থতা এবং পাপ কাজ ও শারীরিক ব্যাধিতে কোন পার্থক্য থাকে না। একজন মানুষের যেমন সুসাস্থ্যের জন্য প্রশংসা ও রোগ–ব্যাধির জন্য নিন্দাবাদ প্রাপ্য নয়, তেমনি পাপাচার ও সদাচারের জন্যও কারোর ধন্যবাদ ও ভর্ৎসনা পাওয়ার কথা নয়।

এর পাশাপাশি অধীনতাবাদের সমর্থক আরেকটা প্রতাপশালী বিধান রয়েছে। সেটা হচ্ছে উত্তরাধিকার বিধান। (laws of heredity) ডারউইন, রাসেল ওয়ালেস (Russel Wallase) এবং তাঁদের অনুগামীরা এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এ বিধান মতে বিগত যুগ যুগকাল ধরে পুরুষানুক্রমিকভাবে যে ধাঁচের চারিত্রিক ধারা চলে আসছে, প্রতিটি মানুষের চরিত্র ও স্বভাব সেই ধাঁচেই গড়ে ওঠে। এই পুরুষানুক্রমিক ধারা যে আকারে স্বভাব ও চরিত্রকে গড়ে তোলে, তাকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা কারোর নেই। এ হিসাবে আজ যে ব্যক্তি দ্বারা কোন খারাপ কাজ সংঘটিত হচ্ছে, সেটা আসলে আজ থেকে একশো বছর আগে তার পরদাদা যে বীজ বপন করেছিল তারই ফল। পরদাদার ভেতরে যে দুষ্কৃতি ছিল, সেটাও সে পূর্বপুরুষদের কাছ থেকেই পেয়েছিল। এই ফলের আত্মপ্রকাশ ঘটবে কি ঘটবেনা, সে ব্যাপারে ঐ

ব্যক্তির ইচ্ছা ও স্বাধীন ক্ষমতার কোন হাত নেই। বরং একটি টক আমের আঁটি থেকে অংকুরিত আমগাছ যেমন টক আম জন্মাতে বাধ্য, সেও ঠিক তেমনি দুষ্কর্ম করতেবাধ্য।

ইতিহাসদর্শনও মানুষের স্বাধীনতা নয়। বরং অধীনতা ও অক্ষমতারই সমর্থক। ইতিহাস দর্শনের আলোকে বহিরাগত উপকরণাদির সামাজিক প্রভাব তার আওতাধীন সমগ্র জনগোষ্ঠীর স্বভাব ও চরিত্রকে প্রভাবিত করে। এজন্য এক ধরনের উপকরণ সমষ্টির প্রভাবাধীন জনগোষ্ঠীর চরিত্রবৈশিষ্ট্য ভিন্ন ধরনের উপকরণ সমষ্টির প্রভাবাধীন জনগোষ্ঠির চরিত্রবৈশিষ্ট্য থেকে আলাদা রকমের হয়ে থাকে। আমরা যদি গভীর দৃষ্টিতে দেখি, তাহলে দুটো জাতির মেজাজ ও স্বভাব চরিত্রের পার্থক্যের জন্য সেইসব বহিরাগত উপকরণাদির বিভিন্নতাকেই দায়ী করতে পারি, যার অধীন তারা বিকাশ লাভ করেছে। এমনিভাবে আমরা যদি বহিরাগত উপকরণাদির আলোকে কোন মানব গোষ্ঠীর চরিত্রবৈশিষ্ট্যকে ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করি, তাহলে নির্ভুলভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি যে, সে কোন্ পরিস্থিতিতে কি ধরনের আচরণ করবে। কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও ক্ষমতার পক্ষে এই সর্বাত্মক বিধানের নির্ধারিত পথের বাইরে যাওয়ার কোন অবকাশই নেই। ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যদি স্বীকার করা হয়, তাহলে একটি জাতির লোকদের কাজ–কর্মে ও চরিত্রে শত শত বছর ধরে যে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় তার কোন ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। কেননা একটি জাতির সকল লোক একমত হয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে একই রকমের কাজ–কর্ম করতে থাকবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এটা কল্পনা করা যায় না।

পরিসংখ্যান বিদ্যাও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মানুষের পরাধীনতাকে সমর্থন করেছে। বড় বড় জনগোষ্ঠী সম্পর্কে বিভিন্ন অবস্থায় যে পরিসংখ্যান সরবরাহ করা হয়েছে, তাকে যখন ঐ অবস্থার উদ্ভাবের জন্য দায়ী বহিরাগত উপকরণাদির আলোকে দেখা হয়েছে। তখন জানা গেছে যে, প্রত্যেক জনগোষ্ঠীতে নির্দিষ্ট উপকরণাদির প্রভাবে নির্দিষ্ট অবস্থার উদ্ভব হয়ে থাকে এবং সেই পরিস্থিতিতে বিপুলসংখ্যক লোকের কর্মকান্ড একেবারেই পরস্পরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে থাকে। এ ধরনের অভিজ্ঞতার সাহায্যে আজকাল এ বিদ্যার এত উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে যে, একজন দক্ষ পরিসংখ্যানবিদ একটি বিরাট জনগোষ্ঠী সম্পর্কে প্রায় নির্ভুলভাবে রায়

দিতে পারে যে, তারা অমুক পরিস্থিতিতে অমুক কাজ করবে। এক বছরে লন্ডন নগরীতে কতগুলো আত্মহত্যার ঘটনা ঘটবে, কিংবা এক বছরে শিকাগো শহরে কতগুলো চুরি সংঘটিত হবে, তা সে বলে দিতে পারে। যদি একটি দেশে অন্য দেশের তুলনায় হত্যাকান্ডের সংখ্যা আনুপাতিক হারে বেশী হয় তাহলে প্রায় বিশুদ্ধভাবেই সে তার অর্থনৈতিক, সামাজিক অথবা প্রাকৃতিক কারণ বিশ্লেষণ করতে সক্ষম। একটি দেশে বা একটি বিরাটকায় জনগোষ্ঠীতে যেভাবে জন্ম, মৃত্যু, অপরাধ ও অন্যান্য ঘটনার গড়পরতা বছরের পর বছর ধরে চলতে থাকে এবং সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে সেই পরিসংখ্যানে যেভাবে ওঠানামা হয়ে থাকে, তার ব্যাখ্যা কেবল একটি কথা দ্বারাই দেওয়া সম্ভব। সে কথাটা এই যে, বহিরাগত উপকরণাদির প্রভাব বড় বড় জনগোষ্ঠীর ওপর এমন ব্যাপকভাবে ও প্রচন্ডভাবে পড়ে যে, ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তিগত ইচ্ছা তার বিরুদ্ধে চলতে পারে না।

বিজ্ঞানের ব্যর্থতা

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্টভাবে জানা গেল যে, যে বিজ্ঞানের ওপর নির্ভর করে মানুষ নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও গর্ববোধকে লালন করে আসছিল, সেই বিজ্ঞান কিভাবে তার সমস্ত চিন্তাগত উন্নতি ও উৎকর্ষ এবং গবেষণা ও আবিষ্কার উদ্ভাবনের জটিল গ্রন্থি উন্মোচনের গৌরব তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয় এবং কিভাবে মানুষ নিজেরই জ্ঞান–গবেষণার ভিত্তিতে নিজেকে উদ্ভিদ, জড় পদার্থ ও নিষ্প্রাণ যন্ত্রের মত একটি অক্ষম ও অসহায় সত্তা বলে মেনে নেয়। কিন্তু এই মেনে নেওয়ার অর্থ এ নয় যে, বিজ্ঞান অদৃষ্ট সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান সত্যিই করে ফেলেছে, বরং এ দ্বারা তো এটাই প্রমাণিত হয় যে, আমরা আমাদের মধ্যে যে ক্ষমতা ও স্বাধীনতার অস্তিত্ব স্বতস্ফুর্ত ভাবেই অনুভব করি, যার নির্দেশাবলী আমরা দিনরাত প্রত্যক্ষ করি এবং যার ভিত্তিতে আমরা ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত কাজের মধ্যে সব সময় পার্থক্য করে এসেছি, বিজ্ঞান সেই ক্ষমতা ও স্বধীনতার ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। শুধু তাই নয়, বরং স্বয়ং বিবেক, যা না থাকলে মানুষের স্বাধীনতা ও ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সম্ভব নয়, তা বিজ্ঞানের গবেষণা ও উদ্ভাবনের উর্ধে প্রমাণিত হয়েছে। কোন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান প্রণালী দ্বারা এখন পর্যন্ত সেই জিনিসটার

রহস্য উদঘাটন করা যায়নি, যা মানুষের জড় নির্মিত দেহের অভ্যন্তরে এমন সব লক্ষণ, কর্মকান্ড ও গুণ-বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব ঘটায়, যা কোন বস্তুগত বিন্যাস এবং কোন রাসায়নিক মিশ্রণের বদৌলতে জন্ম লাভ করেনি।

যাহোক, কোন পদার্থ বিজ্ঞানী যদি বলে যে, মানুষের স্বভাব চরিত্র গঠনে তার স্নায়ুতন্ত্রী ও মগজ কোষের রূপ কাঠামোর অনেকখানি হাত রয়েছে, তাহলে কথাটা বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু তার এ দাবী স্বীকার করা যায় না যে, শারীরিক দোষ-গুণ মানসিক দোষ-গুণের একমাত্র কারণ। অনুরূপভাবে ক্রমবিকাশবাদের প্রবক্তা যদি বলে যে, মানুষ তার বহু সংখ্যক বৈশিষ্ট্য উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে থাকে তবে সে কথা মেনে নেওয়াতে আপত্তি নেই। কিন্তু সে যদি বলে যে, তার সব দোষ-গুণ কেবল উত্তরাধিকার সূত্রেই প্রাপ্ত, তার কাছে নিজস্ব কিছুই নেই, তাহলে অন্যান্য বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে আমরা এ বক্তব্য কোন মতেই গ্রহণ করতে পারি না। একইভাবে ইতিহাস ও পরিসংখ্যান তত্ত্বের ভিত্তিতে যে ধারণা পোষণ করা হয়েছে তার যথার্থতাও শুধু এতটুকুই যে, যেসব বহিরাগত প্রভাবের দরুন ব্যপকভাবে জাতি ও সম্প্রদায় সমূহ প্রভাবিত হয়ে আসছে, তার ফলে ব্যক্তি মানুষও বাধ্যতামূলকভাবে বেশ খানিকটা দোষ-গুণের শিকার হয়ে পড়েছে। তাই বলে এর দ্বারা এটা প্রমাণ করা সম্ভব নয় যে, সামাজিক অবস্থার আবর্তন বিবর্তনে ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও আকাংখার মোটেই কোন স্বাধীনতা নেই এবং সমাজ জীবনের যান্ত্রিকতায় ব্যক্তিবর্গ নিছক প্রাণহীন যন্ত্রাংশের মত নড়াচড়া করছে।

সুতরাং প্রাকৃতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং তার শাখা-প্রশাখা প্রকৃতপক্ষে অদৃষ্ট সমস্যার সমাধান দেয় না। কেবল অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের আলোকে আমাদেরকে এতটুকু অবহিত করে যে, আমাদের জীবনে বাধ্যবাধকতার সীমা কতদূর বিস্তৃত।

নৈতিক দৃষ্টিকোণ

খাঁটি ও নির্ভেজাল নৈতিকতার জগতে মানুষের অক্ষম কিংবা স্বাধীন হওয়ার প্রশ্ন এ হিসেবে আলোচিত হয় না যে, বাহ্যিক পরিস্থিতির গভীরে অন্তর্নিহিত বাস্তবতা কি, বরং এখানে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে, মানুষের চরিত্র ও কর্মের ব্যাপারে ভাল-মন্দ রায় দেওয়া, তার ভাল ও মন্দ আচরণের প্রশংসা বা নিন্দা এবং তার খারাপ ও ভালো কাজের পুরস্কার এবং শাস্তির ফায়সালা কিসের ভিত্তিতে করা হয়ে থাকে। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় যে, এখানে স্বাধীনতাবাদীদের পাল্লা ভারী এবং অধীনতা ও অক্ষমতার প্রবক্তাদের পরাজয় অবধারিত। কেননা মানুষকে যদি একেবারেই অক্ষম ও বাধ্য মনে করা হয় এবং সে যা-ই করে আপন ইচ্ছা ও স্বাধীন ক্ষমতাবলে করে না বলে স্বীকার করা হয়, তাহলে তাকে তার কাজ-কর্মের জন্য দায়ী করার কথা চিন্তা করাই অবৈধ হয়ে দাঁড়ায়। সততা ও অসততার কোন অর্থ থাকে না। ভালো ও মন্দের কোন তাৎপর্য থাকে না। অতি বড় সৎ কর্মশীলও প্রশংসা এবং অতি বড় দুষ্কৃতিকারীও নিন্দার যোগ্য হয় না। অতি বড় সমাজ সেবকও পুরস্কৃত হওয়ার যোগ্য হয় না এবং জঘন্যতম অপরাধীকেও শাস্তি দেওয়া চলে না। আমাদের আদালত, আমাদের আইন, আমাদের পুলিশ, আমাদের জেলখানা, আমাদের বিদ্যালয়, আমাদের নৈতিক শিক্ষাকেন্দ্র, আমাদের ওয়াজ-নসিহত, বক্তৃতা-বিবৃতি, সাহিত্য চর্চা- এক কথায় মানুষকে স্বধীন ও সক্ষম মনে করে তার সংশোধন, সংস্কার এবং উপদেশের জন্য যত রকমের উদ্যোগ ও আয়োজন করা হয়েছে, তার সবই সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল ও বৃথা সাব্যস্ত হয়।

কিন্তু গবেষণা ও তত্ত্বানুসন্ধানের ময়দানে দুচার কদম এগুলেই বুঝা যায় যে, এখানে কেবল এতটুকু যুক্তি দ্বারাই স্বাধীনতাবাদ ও অধীনতাবাদের (জোবরিয়াত ও কাদরিয়াত) পার্থক্য নির্ণয় করা যায় না। নৈতিকতার জগতে কাজের মূল্য ও মর্যাদা চরিত্র ও কাজে উদ্বুদ্ধকারী উপকরণসমূহের ভিত্তিতে নিরূপণ করা হয়ে থাকে। আর

কর্মে উদ্বুদ্ধকারী উপকরণসমূহ ও চরিত্রের প্রশ্ন ওঠা মাত্রই মানুষের চরিত্র কোন্ কোন্ উপাদানে তৈরী এবং কোন্ কোন্ আভ্যন্তরীণ উপকরণ চরিত্র ও কর্মের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়, তার অনুসন্ধান চালানো অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। এই পর্যায়ে এসে আলোচনার ধারা পুনরায় প্রাকৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও অতিপ্রাকৃতিক তত্ত্বের দিকে মোড়নেয়।

যারা মানুষকে ইচ্ছা ও স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত এক অসহায় ও অক্ষম সৃষ্টি মনে করে, তাদের বক্তব্য এই যে, মানুষের চরিত্র দুটো শক্তিশালী উপাদানে তৈরী। একটি হলো তার সহজাত মৌলিক স্বভাব প্রকৃতি, অপরটি হলো বহিরাগত প্রভাব যার দ্বারা সে প্রতি মুহূর্তে প্রভাবিত হচ্ছে এবং যার আদলে অনবরত তার রূপান্তর ঘটে চলেছে। প্রথম জিনিসটা তো নিশ্চিতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত। এতে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার আদৌ কোন হাত নেই। একজন মানুষ মায়ের পেট থেকে যে স্বভাব-প্রকৃতি নিয়ে জন্মে, সেটাই তার চরিত্রের মৌলিক উপাদান। জন্মগত খারাপ স্বভাব থেকে ভালো কাজ এবং জন্মগত ভালো স্বভাব থেকে খারাপ কাজ সংঘটিত হওয়া অসম্ভব। তারপর আসে বহিরাগত প্রভাবের ভূমিকার কথা। প্রাকৃতিক ও সামাজিক প্রভাব এই বহিরাগত প্রভাবেরই অংশ বিশেষ। এগুলো সমবেতভাবে সহজাত স্বাভাবের মৌল উপাদানকে লালন করে এবং তার যোগ্যতা ও ক্ষমতা অনুসারে তাকে একটা আকৃতিতে গড়ে তোলে। সহজাত উত্তম স্বভাবের মানুষ যদি ভালো পরিবেশ পায় তবে সে ওলী-দরবেশ হয়ে যায়। আর জন্মগতভাবে খারাপ স্বভাবের মানুষ যদি খারাপ পরিবেশ পায় তবে সে শয়তানের রূপ ধারণ করে। অনুরূপ ভালো স্বভাবধারী মানুষ খারাপ পরিবেশ পেলে তার ভালো স্বভাবের গুণমাধুরী খানিকটা কমে যায়। আর খারাপ স্বভাবধারী মানুষ ভালো পরিবেশ পেলে তার খারাপ স্বভাবের কদর্যতা হ্রাস পায়। মাটি, পানি, প্রাকৃতিক আবহাওয়া ও উদ্ভিদ পরিচর্যার ধরনের সাথে বীজের সম্পর্ক যেমন, জন্মগত স্বভাব ও পরিবেশের সম্পর্ক ঠিক তেমনি। উদ্ভিদের আসল উপাদান বীজ। উদ্ভিদ ভাল ফল দেবে কি মন্দ ফল দেবে, তা নির্ভর করে এইসব বহিরাগত উপকরণের ওপর। মানুষের অবস্থাও এ রকমই। উপরোক্ত দুই উপাদান ও উপকরণের কাছে সে অসহায়। সে না পারে নিজের জন্মগত স্বভাব

বদলাতে, না পারে নিজের ইচ্ছামত বাইরের কোন বিশেষ পরিবেশ বেছে নিতে, আর না ঐ পরিবেশের প্রভাবে প্রভাবিত হওয়া না হওয়া তার ইচ্ছার অধীন।

কাদরিয়া তথা স্বাধীনতাবাদী গোষ্ঠীর মধ্যে যারা চরমপন্থী, তারা তো উপরোক্ত মতামতকে গ্রাহ্যই করে না। তাদের মতে, মৌলিখ স্বভাব এবং পরিবেশের প্রভাবের যদি মানুষের চরিত্র গঠনে কোন হাত থেকেই থাকে, তবে সেটা কেবলমাত্র ইচ্ছাবহির্ভূত কার্যকলাপ পর্যন্তই। বাদ বাকী যেসব মানুষ জেনে বুঝে আপন বাছ–বিচার ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা প্রয়োগ করতঃ স্বেচ্ছায় করে, তাতে উক্ত দুটো উপাদানের কোনই হাত নেই। এ সব কাজ তার নিজস্ব স্বাধীন সিদ্ধান্তেরই ফল। এটা হলো স্বাধীনতাবাদের নিরেট ও চরম রূপ। কেউ কেউ এই মতবাদ উপস্থাপন করে থাকেন। তবে এটা গ্রহণ করা কঠিন। কেননা সচেতনতা, বুদ্ধি–বিবেক, বাছ–বিচার ক্ষমতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা যা মানুষের ইচ্ছাকৃত, কার্যকলাপের ভিত্তি, –এর সবই খোদাপ্রদত্ত। এগুলো মানুষ নিজের চেষ্টা দ্বারা অর্জনও করেনি, আর এতে কোন হ্রাস–বৃদ্ধি করতেও সে সক্ষম নয়। তাহলে এসব উপকরণের সাহায্যে সে নিজের জন্য কাজের যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করে, তাকে তার স্বাধীন ক্ষমতার ফল কিভাবে বলা যায়?

মধ্যমপন্থী স্বাধীনতাবাদীদের অভিমত এ ক্ষেত্রে এই যে, মানুষের চরিত্রে জন্মগত স্বভাব ও বাইরের যথেষ্ট হাত রয়েছে–এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই। কেননা মানুষ ভালো ও মন্দের প্রবণতা এবং সৎ ও অসৎ কর্মের যোগ্যতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে থাকে এবং স্বভাবগত ও পরিবেশগত চাপের ফলে তার চরিত্র একটা বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করে থাকে। কিন্তু এই দুটো উপাদান ছাড়া একটা তৃতীয় উপাদানও রয়েছে, যা তার চরিত্র গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে। সেটা হলো মানুষের অপরিকল্পিত ইচ্ছা। আমরা মানুষকে যে সৎ বা অসৎ বলি, সেটা তার জন্মগত স্বভাব কিংবা সামাজিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে বলি না। বরং এই অপরিকল্পিত ইচ্ছার ভিত্তিতেই বলে থাকি। প্রথম দুটো উপাদানের বিচারে মানুষ সম্পূর্ণ অক্ষম ও ভাগ্যনির্ভর। তাই ঐ দুটো উপাদানের আওতায় তার চরিত্রের যে অংশটি গড়ে ওঠে, নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তার কানাকড়িও মূল্য নেই। বস্তুতঃ এই তৃতীয় জিনিসটা অর্থাৎ মানুষের অপরিকল্পিত ইচ্ছার ভিত্তিতেই চারিত্রিক মূল্যমান নির্ধারণ এবং

সততা ও অক্ষমতার ব্যাপারে রায় দেওয়া সম্ভব। তত্ত্বগতভাবে এ বক্তব্য খুবই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু আসল সমস্যা এই যে, আমাদের কাছে এমন কোন মানদন্ড নেই, যার সাহায্যে আমরা মানুষের চরিত্রে জন্মগত স্বভাব, বাহ্যিক পরিবেশ ও অপরিকল্পিত ইচ্ছার অবদানগুলোকে আলাদা আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে পারি এবং আমাদের নৈতিক সিদ্ধান্তকে শুধুমাত্র তৃতীয় উপাদান পর্যন্ত সীমিত রাখতে পারি। এই তৃতীয় উপাদানটার পরিমাণের ওপরই যদি নৈতিক মূল্যমান নির্ধারণ নির্ভর করে, তাহলে আমাদের পক্ষে কোন ব্যক্তিকে সৎ বা অসৎ বলে রায় দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। কোন দাঁড়িপাল্লায় মেপে বা কোন বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় বিশ্লেষণ করে আমরা এটা জানতে সক্ষম নই যে, একজন সৎ মানুষ স্বীয় অপরিকল্পিত ইচ্ছা প্রয়োগের মাধ্যমে কতখানি সৎ। অনুরূপভাবে আমরা এটাও জানতে পারি না যে, একজন অসৎ মানুষ বাধ্য হয়ে কতখানি এবং ইচ্ছাকৃতভাবে কতখানি অসৎ। কাজেই স্বাধীনতাবাদের এই মতবাদ মেনে নেওয়ার পর আমাদের যাবতীয় নৈতিক মতামত অচল হয়ে যায়। শুধু অচল হয় না, বরং এরপর আমাদের যাবতীয় ফৌজদারী দন্ডবিধিও বাতিল না করে উপায় থাকে না এবং আদালত ও জেলখানা বন্ধ করে দেওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কেননা যেসব অপরাধীকে পাকড়াও করা হয়, যাদের বিরুদ্ধে আমাদের আদালতের বিচারকগণ শাস্তির রায় জারি করেন এবং যাদেরকে জেলখানায় ঢুকানো হয়, তাদের সম্পর্কে আমাদের উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিচারপতিও জানেন না যে, তাদের অপরাধে তাদের সেই অপরিকল্পিত ইচ্ছার অবদান কতখানি। এই মৌলিক জিনিসটাই যখন অজানা, তখন শাস্তির পরিমাণ অপরাধীর স্বাধীন ইচ্ছার পরিমাণের সাথে সংগতিশীল হবে এটা কিছুতেই সম্ভব নয়।

এই পর্যায়ে স্বাধীনতাবাদ এমন এক ভুবনে উপনীত হয়, যা ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সে হাতড়ে হাতড়ে পথ চলার যতই চেষ্টা করুক, হোঁচট ও আছাড় না খেয়ে কয়েক কদমও এগুতে পারে না। শেষ পর্যন্ত পেছনে ফিরে সে অধীনতাবাদকে বলে যে, আমার মতবাদ দ্বারা যদি নৈতিক বিচার–ফায়সালার পথ রুদ্ধ ও আদালত ব্যবস্থা অচল হয়ে যায়, তবে তোমার মতবাদ দ্বারাও অনুরূপ অথবা তারচেয়েও খারাপ ফল ফলে। তোমার মতবাদের দৃষ্টিতে তো মানুষের ওপর তার কোন কাজের দায়–দায়িত্বই বর্তায় না। ভালো মন্দ বলে রায় দেওয়া, প্রশংসা বা নিন্দা করা অথবা

শাস্তির রায় দেওয়া তাহলে কিসের ভিত্তিতে হবে? যে ব্যক্তি আপন কাজের জন্য দায়ী নয়, তার সৎ বা অসৎ হওয়া কোন ব্যক্তির রুগ্ন কিংবা সুস্থ হওয়ার মতই। অতএব, জ্বর হয়েছে বলে যখন কাউকে শাস্তি দেওয়া যায় না, তখন সে চুরি করেছে বলে শাস্তি কেন দেওয়া হবে?

এ প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক জবাব অধীনতাবাদ তথা অদৃষ্টবাদের কাছেও নেই। সে বড় জোর এতটুকু বলতে পারে যে, পৃথিবীতে প্রতিটি কাজের একটা স্বাভাবিক পরিণতি ও ফলাফল রয়েছে। রোগ–ব্যাধির স্বাভাবিক ফল যেমন যন্ত্রণা এবং সুস্থতার স্বাভাবিক ফল শান্তি ও আনন্দ, সদাচারের স্বাভাবিক ফল যেমন প্রশংসা ও পুরস্কার, অনাচারের স্বাভাবিক পরিণতি তিরস্কার ও শাস্তি এবং আগুনে হাত দিলে যেমন হাত পুড়ে যাওয়া অনিবার্য ও অবধারিত, তদ্রুপ অপরাধ করলে তার কোন না কোন ধরনের শাস্তি পাওয়া অবশ্যম্ভাবী চাই মানুষের ওপর তার দায়–দায়িত্ব বর্তাক বা না বর্তাক। কিন্তু এ জবাব কেবল সেই অবস্থায় শুদ্ধ হতে পারে, যখন আমরা মানুষকে একটা বুদ্ধি–বিবেক সম্পন্ন ও মন–মগজ সম্পন্ন সত্তা নয়, বরং একটা নিরেট বস্তু সর্বস্ব সত্তা মেনে নেই এবং এ কথা স্বীকার করে নেই যে মানুষের ভেতরে মন, বিবেক, আত্মা বলতে কিছু নেই। আছে শুধু একটা প্রাকৃতিক অবয়ব, যা একটা ধরাবাধা নিয়ম অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে এবং মানুষ গাছ, পাহাড়, নদ–নদী ও অন্যান্য অচেতন পদার্থের মতই তার আধিপত্য মেনে চলছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মনুষ্য জীবনের এই যান্ত্রিক বিশ্লেষণ কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। এর যুক্তি প্রমাণ নিয়ে আলোচনা করার এখানে অবকাশ নেই বটে, তবে তা যে অতিশয় দুর্বল, এ কথা ধ্রুব সত্য। এ যুক্তি মেনে নেওয়ার প্রাথমিক ফল এই দাঁড়াবে যে, আইন, নৈতিকতা ও ধর্ম–সবই মূল্যহীন হয়ে পড়বে এবং স্বয়ং মানুষ মানুষ হিসেবে অন্যান্য সৃষ্টির তুলনায় বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে কোন শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী থাকবে না।

নৈতিক দর্শনের ব্যর্থতা

এই গোটা আলোচনার সারকথা এই যে, মানুষ অদৃষ্টের নিগড়ে অসহায়ভাবে বন্দী, না স্বাধীন ক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তির অধিকারী, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসতে নৈতিক দর্শন ব্যর্থ হয়েছে। নিরেট নৈতিক যুক্তি–প্রমাণ দ্বারা আমরা

নিশ্চিতভাবে জানতে পারি না যে, মানুষের কর্ম ও চরিত্র সম্পর্কে অধীনতাবাদ সঠিক, না স্বাধীনতা তত্ত্ব সঠিক। মানুষকে দায়িত্বশীল স্বাধীন কর্মক্ষমতা সম্পন্ন সাব্যস্ত করার পক্ষে যতটা শক্তিশালী যুক্তি–প্রমাণ রয়েছে, প্রায় ততখানি অকাট্য যুক্তি তাকে দায়িত্বহীন এবং সম্পূর্ণ অক্ষম ও অসহায় সাব্যস্ত করার পক্ষেও রয়েছে।

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ[১]

এবার এ সমস্যার শেষ দিকটা বাদ রয়ে গেছে। সেটা হচ্ছে ধর্মীয় দিক। সমস্যাটা দর্শনে যেভাবে আলোচিত হয়, প্রায় সেইভাবেই এটা ধর্মেরও আলোচ্য বিষয়। তবে এখানে জটিলতা দর্শনের তুলনায় অনেক বেশী। দর্শনের দৃষ্টি তো শুধু অতি প্রাকৃতিক বিষয়াবলীর ওপর নিবদ্ধ। মানুষের বাস্তব জীবনের সাথে নৈতিকতা ও বাস্তব কর্মকুশলতার যে সম্পর্ক, দর্শনের সে সম্পর্ক নেই। কিন্তু ধর্ম কোন না কোনভাবে বাস্তব কর্মকুশলতা ও অতি প্রাকৃতিক বিষয় উভয়ের প্রতিই দৃষ্টি দিয়েছে। আপন আদর্শে ও শিক্ষায় এই দুটোরই সমাবেশ ঘটিয়েছে। ধর্ম একদিকে মানুষের ওপর বিভিন্ন আদেশ ও নিষেধ আরোপ করে, আনুগত্যের জন্য পুরস্কার এবং নাফরমানীর জন্য শাস্তি প্রয়োগের বিধান উপস্থাপিত করে। আর এজন্য মানুষের আপন কর্মকান্ডের জন্য দায়ী এবং কিছুনা কিছু স্বাধীন ইচ্ছা ও ক্ষমতার অধিকারী হওয়া জরুরী হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে সে এমন এক উচ্চতর সত্তা বা উচ্চতর আইনের কথাও বলে, যার একচ্ছত্র আধিপত্য মানুষসহ সমগ্র বিশ্বনিখিলের ওপর পরিব্যাপ্ত এবং যার দুর্ভেদ্য নিয়ন্ত্রণে আটকা পড়ে আছে ভাঙ্গা গড়ার শাশ্বত নিয়মে বিকাশমান বিশ্বজগত। তাই ধর্মতত্ত্বে এ বিষয়টা দর্শন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও নৈতিকতা এ তিনটির সব কটির চেয়ে জটিল। কেননা এই তিনটি তো সমস্যার যে কোন একটি দিককে প্রমাণ করা এবং অন্যান্য দিককে তারসাথে সংগতিশীল করার প্রয়োজনে সত্যকে বিকৃত করতেও কুণ্ঠিত নয়। কিন্তু ধর্ম একই সাথে উভয়কে সঠিক প্রমাণ

---

[১] Theological

এই পদ্ধতিকে বিবেকের সাথে সামঞ্জশীল ও যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ করার জন্য পরস্পর বিরোধী উভয় দিকের মধ্যে সমন্বয় বিধান করার একটা মধ্যম পন্থা উদ্ভাবনে সে বাধ্য।

দুনিয়ার অন্যান্য ধর্ম এ জটিলতা নিরসনের কি পন্থা অবলম্বন করেছে, সে আলোচনার এখানে অবকাশ নেই। কেননা আমাকে শুধু ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে। তাছাড়া আলোচনা সংক্ষিপ্ত করার খাতিরেও তা এই বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখাই জরুরী মনে হচ্ছে।

বিশুদ্ধ ইসলামী মতাদর্শ

অতিপ্রাকৃতিক বিষয়ে ইসলামের সঠিক শিক্ষা এই যে, যে জিনিস যতটুকু জানা দরকার ছিল, তা আল্লাহ ও রসুল জানিয়ে দিয়েছেন। এরচেয়ে বেশী জানতে চেষ্টা করা এবং যেসব বিষয়ে অকাট্য ও নিশ্চিত তথ্য অবগত হওয়া বা যার নিগুঢ়তম রহস্য উদঘাটন করার কোন উপায় উপকরণ আমাদের হাতে নেই, যা না জানলে আমাদের কোন ক্ষতিও নেই, তার তত্ত্ব অন্বেষণে প্রবৃত্ত হওয়া যেমন নিরর্থক, তেমনি বিপজ্জনক। তাই কুরআনে বলা হয়েছেঃ

لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ (المائدة : ١٠١)

"এমন সব বিষয়ে প্রশ্ন করোনা, যার নিগুঢ় রহস্য তোমাদের সামনে উদঘাটন করলে তোমাদের খারাপ লাগবে।" (মায়েদা–১০১)

আর এজন্যই বলা হয়েছে যেঃ

مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

"রসুল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা নিয়ে নাও, আর যা নিষেধ করেছেন তা থেকে নিবৃত্ত থাক।" (হাশর)

একই কারণে হাদীসে বেশী প্রশ্ন করা এবং নিষ্প্রয়োজন বিষয়ে মাথা ঘামানোকে অবাঞ্ছনীয় বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। রসূল (সাঃ) বলেছেনঃ

إِنَّ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكَهُ مَا لَا يَعْنِيهِ

"নিষ্প্রয়োজন ও অসংলগ্ন ব্যাপার এড়িয়ে যাওয়াই ইসলামের জন্য কল্যাণকর।"[১]

তাকদীরের ব্যাপারটাও এ ধরনেরই একটা সমস্যা। রসুল (সাঃ) এ ব্যাপারেও আলোচনা এড়িয়ে যাওয়ার জন্য বারংবার তাকিদ দিয়েছেন। একবার সাহাবীগণ এ বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। সহসা রসুল (সাঃ) সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। আলাপচারিতার বিষয় জানতে পেরে তাঁর মুখমন্ডল ক্রোধে লাল হয়ে গেল। তিনি বললেনঃ "তোমাদেরকে কি এ সবেরই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে? আমাকে কি এসবের জন্যই তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে? পূর্ববর্তী জাতিগুলো এ ধরনের বিষয়ে মাথা ঘামানোর কারনেই ধ্বংস হয়েছে। আমার চূড়ান্ত নির্দেশ এই যে, তোমরা এ ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত হয়োনা।"[২] হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য এক প্রসঙ্গেঁ বলেছিলেন যে, "যে ব্যক্তি তাকদীরের বিষয়ে বাকবিতন্ডায় লিপ্ত হবে, কেয়ামতের দিন তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি চুপ থাকবে, তাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করা হবেনা।" এর অর্থ এই যে, এ সমস্যাটা এমন নয় যে, এর সম্পর্কে তোমাদের একটা কিছু মত স্থির করা শরিয়তের বিধি অনুসারে জরুরী। সুতরাং তেমরা যদি এ ব্যাপারে মোটেই আলাপ-আলোচনা না কর, তবে কেয়ামতে তোমাদের কাছে কোন প্রশ্নই করা হবে না। কিন্তু তোমরা যদি আলোচনা কর, তাহলে সে আলোচনা শুদ্ধ অথবা অশুদ্ধ হবে। যদি ভুল হয়, তাহলে এমন একটা ব্যাপারে তোমাদের জবাবদিহী করতে হবে, যা নিয়ে আলাপ-আলোচনা ও বাক-বিতন্ডা করার কোন দরকার ছিলনা। অন্য কথায়,

---

[১] এ হাদীসটি ইমাম জুহারী ইমাম জয়নুল আবেদীনের প্রমুখাৎ বর্ণনা করেছেন। (তিরমিযী)

[২] হযরত ওমর, হযরত আয়েশা, হযরত আনাস, হযরত আবু হোরায়রা ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ) থেকে বিভিন্ন সনদে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। (তিরমিযী ও ইবনে মাজা দ্রষ্টব্য)

আলোচনা করলে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। নীরব থাকলে ক্ষতির আশংকা নেই। একবার রসূল (সাঃ) রাত্রিকালে হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত ফাতেমা (রাঃ)–এর বাড়ীতে গেলেন। তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তোমরা তাহাজ্জুদের নামায পড় না কেন? হযরত আলী (রাঃ) জবাব দিলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মন আল্লাহর হাতে। তিনি যদি আমাদের জাগ্রত হওয়া চান, তবে আমরা অবশ্যই জাগ্রত হব।" এ কথা শুনে রসূল (সাঃ) তৎক্ষণাত ফিরে গেলেন এবং উরুতে হাত চাপড়ে বললেনঃ

" وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا "

"মানুষ সব চেয়ে ঝগড়াটে হয়ে জন্মেছে।" [৩]

এ জন্যই হাদীসবেত্তা ও ফেকাহবিদগণ সংক্ষেপে কেবল এতটুকু বিশ্বাস করাই যথেষ্ট মনে করেছেন যে, وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ

"তাকদীরের ভালো মন্দ সবই আল্লাহর তরফ থেকে আসে।" তাঁরা এ ব্যাপারে বেশী অনুসন্ধান করা এবং "অমুক কাজ কপালে লেখা ছিল, তাই না করে উপায় ছিল না, আর অমুক কাজ না করেও পারা যেত, ইচ্ছা করেই করা হয়েছে," ইত্যাকার পাকাপাকি বক্তব্য দেওয়ার কঠোর নিন্দা করেছেন। কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও অতীতের মান্যগণ্য মুরব্বীদের নিষেধ করা সত্ত্বেও অন্যান্য জাতির দার্শনিক ও জড়বাদী অদৃষ্ট তত্ত্ব অধ্যয়নের কারণে তাকদীরের ব্যাপারটা মুসলিম সমাজেও একটা সমস্যার রূপ ধারণ করে। এ বিষয়ে এত বেশী আলোচনা হয় যে, শেষ পর্যন্ত এটা ইসলামী আকিদা শাস্ত্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিগণিত হয়।

---

[৩] এ হাদীসটি ইমাম জুহারী ইমাম জয়নুল আবেদীন থেকে এবং জয়নুল আবেদীন হযরত হোসাইন বিন আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন (বুখারী ও নাসায়ী) হাদীস বেত্তাগণ রসূল (সাঃ)–এর ফিরে যাওয়া এবং আয়াতটি পড়ার বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু আমি এর সুস্পষ্ট মর্ম এই বুঝি যে, কর্ম জীবনের নৈমিত্তিক ব্যাপারে তাকদীর তত্ত্ব দ্বারা যুক্তি প্রদর্শন করা রসূল (সাঃ)–এর পছন্দ হয়নি।

ইসলামী আকিদা শাস্ত্রবিদদের মতামত

এ ব্যাপারে ইসলামী আকিদা শাস্ত্রবিদদের দুটো প্রসিদ্ধ গোষ্ঠী রয়েছে। একটির নাম জাবরিয়া, অপরটির নাম কাদরিয়া। এখানে এই দুই গোষ্ঠীর সমগ্র যুক্তিতর্ক উদ্ধৃত করা খুবই কষ্টকর। এজন্য একখানা আলাদা গ্রন্থের উপযোগী পরিসর প্রয়োজন। তথাপি আমি তাদের যুক্তি–তর্কের একটা সহজবোধ্য সংক্ষিপ্ত সার এখানেতুলে ধরবো।

কাদরিয়া মতবাদ

মুতাজেলা এবং অন্য কয়েকটি ফের্কার আকিদা এই যে, আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করার পর তাকে কাজ করার ক্ষমতা দিয়েছেন এবং ভালো ও মন্দ বাছ–বিচার করার ভার তার ওপর ন্যস্ত করেছেন। এরপর সে নিজেই নিজের ক্ষমতা ও ইচ্ছা মোতাবেক সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ভালো কাজ বা মন্দ কাজ করে থাকে। আর এই স্বাধীনতার কারণেই সে দুনিয়ার জীবনে প্রশংসা ও নিন্দা এবং আখেরাতে শাস্তি ও পুরস্কারের যোগ্য বিবেচিত হয়। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে কুফরী ও নাফরমানীর জন্য যেমন বাধ্য করা হয়নি, তেমনি বাধ্য করা হয়নি ঈমান আনতে ও ফরমাবরদারী করতে। বরং তিনি নবী–রসুলদেরকে পাঠান, কিতাব নাজিল করেন। ভালো কাজের আদেশ দেন ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করেন। ভুল ও শুদ্ধ এবং হক ও বাতিলকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেন এবং তাদেরকে সাবধান করে দেন যে, সঠিক পথ ধরে চললে তোমরা মুক্তি পাবে এবং ভুল পথে চললে তার খারাপ পরিণতি ভোগ করবে।

সর্বপ্রথম এই মতবাদের মূলনীতিগুলো প্রণয়ন করেন ওয়াসেল বিন আতা আল গাজ্জাল। তিনি বলতেন যে, আল্লাহ তায়ালা ন্যায়বিচারক ও মহাজ্ঞানী। তিনি কোন জুলুম বা অন্যায় করতে পারেন এমন কথা বলাই জায়েজ নেই। এ কথাও বলা বৈধ হতে পারেনা যে, তিনি নিজেই তাঁর বান্দাদেরকে যেসব কাজ করতে বলেন এবং যেসব কাজ করতে নিষেধ করেন, বান্দারা তার বিপরীত চলুক বলে তিনি নিজেই ইচ্ছা ও আকাংখা করেন। আর এভাবে বান্দারা যে কাজ আল্লাহর হুকুমেই করেছে, তারজন্য তাকে শাস্তি দেওয়াও তাঁর পক্ষে বৈধ নয়। সুতরাং ভালো ও মন্দ

কাজের কর্তা বান্দাহ নিজেই। সে ঈমান আনবে, না কুফরী করবে, আল্লাহর আনুগত্য করবে, না নাফরমানী করবে, সেটা সে নিজ স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারেই স্থির করে। আর আল্লাহও এইসব কাজের ক্ষমতা তাকে দান করেছেন। ইবরাহীম বিন সাইয়ার আন্‌নাজ্জাম এর সাথে অতিরিক্ত এটাও সংযোজন করেছেন যে, আল্লাহ শুধু ভালো জিনিসের ব্যাপারেই ক্ষমতাবান। মন্দ ও অকল্যাণ তাঁর ক্ষমতাবহির্ভূত। মুয়াম্মার বিন আব্বাস আস্‌সালামী এবং হিশাম বিন আমর আল কুতী এ ক্ষেত্রে আরো উগ্র মত পোষণ করেছেন। তিনি "অদৃষ্টের ভালো ও মন্দ সবই আল্লাহর তরফ থেকে হয়" এই বিশ্বাস পোষণকারীদেরকে কাফের ও গোমরাহ আখ্যায়িত করেছেন। কেননা তাঁর মতে এ বিশ্বাস আল্লাহকে নির্দোষ সাব্যস্ত করার বিপক্ষে য়ায়। এ ধারণা আল্লাহকে অত্যাচারী সাব্যস্ত করে। এ'দের পর জাহেজ, খাইয়াত, জিয়ালী, কাজী, আব্দুল জব্বার প্রমুখ জাঁদরেল মুতাজেলা দার্শনিক অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, বান্দা যা কিছু করে তার স্রষ্টা আল্লাহ নন, বরং বান্দা নিজেই তা সৃষ্টি করে। আর বান্দা যে কাজ করতে অক্ষম তা তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া আল্লাহর পক্ষে বৈধ নয়।

কুরআনে কাদরিয়া মতবাদের প্রমাণ

এ মতবাদের পক্ষে মুতাজেলাগণ কুরআনের বহু আয়াত থেকে প্রমাণ দর্শিয়েছেন উদাহরণস্বরূপঃ

(১) যেসব আয়াতে বান্দার কার্যকলাপের জন্য বান্দাকেই দায়ী করা হয়েছে; যেমন

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ (بقره٢٨)

"তোমরা কিভাবে কুফরী কর? অথচ তোমরা নিষ্প্রাণ ছিলে, আল্লাহ তোমাদেরকে প্রাণ দান করেছেন।" (বাকারা–৩৮)

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتَابَ بِاَيْدِيْهِمْ ثُمَّ
يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ (بقره-٧٩)

"যারা স্বহস্তে কিতাব লেখে অতঃপর বলে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, তাদের জন্য ধ্বংস।" (বাকারা-৭৯)

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰى
قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ (الانفال ٥٣)

"এর কারণ এই যে, আল্লাহ কোন জাতিকে যে নিয়ামত দান করেন, তা ঐ জাতি নিজেই তার অবস্থা না পাল্টানো পর্যন্ত পাল্টান না।" (আনফাল-৫৩)

مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ (النساء:١٢٣)

"যে খারাপ কাজ করবে, সেই মোতাবেকই সে কর্মফল ভোগ করবে।" (নিসা-১২৩)

كُلُّ امْرِئٍۢ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ (الطور-٢١)

"প্রত্যেক মানুষ নিজের কর্মফলের হাতে জিম্মী।" (তূর-২১)

(২) যেসব আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষের নিজের কার্যকলাপের ভিত্তিতেই পুরস্কার ও শাস্তি প্রদত্ত হবে। যেমনঃ

اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۢ بِمَا كَسَبَتْ (المومن:١٧)

"আজ প্রত্যেক প্রাণীকেই তার কর্ম অনুসারে প্রতিফল দেওয়া হবে।" (মুমিন-১৭)

اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (الجاثيه:٢١٤)

"আজ তোমাদের কৃতকর্মের বদলা দেওয়া হবে।" (জাসিয়া-২১৪)

هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (النحل-٩٧)

"তোমাদেরকে কি তোমাদের কর্মফল ছাড়া অন্য কোন প্রতিফল দেওয়া হবে?" (নাহল–৯৭)

(৩) যেসব আয়াতে জুলুম, অন্যায় ও নিন্দনীয় কার্যকলাপ থেকে আল্লাহকে পবিত্র ও নিষ্কলুষ ঘোষণা করা হয়েছে। যেমনঃ

اَلَّذِىْٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهٗ (السجده-٧)

"যিনি তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিকে উত্তম করেই সৃষ্টি করেছেন।" (সিজদা–৭)

বস্তুতঃ কুফরী যে ভালো জিনিস নয়, তা সর্বজনবিদিত।

" وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ ۔ (الحجر-٨٥)

"আর আমি আসমান, যমীন ও তন্মধ্যস্থ যাবতীয় জিনিসকে ন্যায়সঙ্গতভাবে সৃষ্টি করেছি।" (আল্ হিজর–৮৫)

বস্তুতঃ কুফরী যে ন্যায়সঙ্গত নয়, তা সর্বস্বীকৃত।

وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ (حم السجده-٤٦)

"তোমার প্রতিপালক বান্দাদের জন্য কখনো জালেম নন।" (হামিম সিজদাহ–৪৬)

وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعٰلَمِيْنَ (آل عمران-١٠٨)

"আল্লাহ জগদ্বাসীর ওপর জুলুম করতে চাননা।" (আল ইমরান–১০৮)

(৪) যে আয়াতগুলোতে কাফের ও গুনাহগারদেরকে তাদের অপকর্মের জন্য ভর্ৎসনা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, তাদেরকে ঈমান আনতে ও আল্লাহর হুকুম মেনে চলতে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন বাধা দেওয়া হয়নিঃ

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ
إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا (بنی اسرائیل-۹۳)

"মানুষের কাছে যখন হেদায়াত এলো, তখন তারা নিজেরাই প্রশ্ন তুললো যে, 'কী। আল্লাহ আবার মানুষকে রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছে নাকি?' নচেত তাদের ঈমান আনার পথে অন্য কোন বাধা ছিলনা।" (বনী ইসরাইল–৯৩)

مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ (ص-۷۵)

"তোমাকে সিজদা করতে বাধা দিল কিসে?" (সোয়াদ–৭৫)

فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (انشقاق-۲۰)

"তাদের কি হলো যে ঈমান আনছেনা?" (ইন্‌শিকাক–২০)

لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (آل عمران-۱۰)

"তোমরা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখ কেন?" (আল্ ইমরান–১০)

বাস্তবিকপক্ষে আল্লাহই যদি মানুষকে ঈমান আনতে বাধা দিতেন এবং কুফরী ও নাফরমানী করতে বাধ্য করতেন, তাহলে তাদেরকে এ ধরনের প্রশ্ন করা সঙ্গত হতোনা। কোন ব্যক্তি যদি কাউকে কক্ষে আটক করে বলে যে তুমি বের হওনা কেন, তবে সেটা একটা অযৌক্তিক প্রশ্ন হবে। সুতরাং আল্লাহ সম্পর্কে এরূপ ধারণা কিভাবে করা যেতে পারে যে, একদিকে তিনি মানুষকে সত্যের পথ থেকে দূরে ঠেলে দেবেন, আবার বলবেন যে, তোমরা কোথায় সরে যাচ্ছ? নিজেই তাদেরকে বিপথগামী করবেন আবার বলবেন যে, কোথায় উদভ্রান্ত হয়ে ছুটে যাচ্ছ? তাদের মধ্যে কুফরীর মনোভাব সৃষ্টি করবেন আবার বলবেন যে, কুফরী কর কেন? সত্যকে মিথ্যা দিয়ে আচ্ছন্ন করতে বাধ্য করবেন আবার বলবেন, সত্যকে মিথ্যা দিয়ে ঢাকছ কেন?

(৫) যেসব আয়াতে ঈমান ও কুফরীকে বান্দার ইচ্ছানির্ভর বলা হয়েছে। যেমনঃ

فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ (الكهف-٢٩)

"অতএব যার মনে চায় ঈমান আনুক যার ইচ্ছা হয় অস্বীকার করুক।" (কাহাব-২৯)

فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا (المزمل ١٩)

"যার ইচ্ছা হয় আপন প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক।" (মুজাম্মেল-১৯)

শুধু এখানেই ক্ষান্ত নয়। বহু সংখ্যক আয়াতে কুফরী ও খোদাদ্রোহিতাকে আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল যারা মনে করে, তাদের নিন্দাও করা হয়েছে। যেমনঃ

سَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَآ اَشْرَكْنَا
(الانعام-١٤٨)

"মোশরেকরা নিশ্চয়ই বলবে যে, আল্লাহ না চাইলে আমরা শেরক করতাম না।"(আনয়াম-১৪৮)

وَقَالَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا
مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ (النحل-٣٥)

"মোশরেকরা বলেছে যে, আল্লাহ না চাইলে আমরা তাঁর ছাড়া আর কারুর ইবাদাত করতাম না।" (নাহল-৩৫)

(৬) যেসব আয়াতে বান্দাদেরকে নেক কাজ করার আহবান জানানো হয়েছে।যেমনঃ

وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ (آل عمران - ١٣٤)

"তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা পাওয়ার জন্য ছুটে যাও।" (আল ইমরান–১৩৪)

اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ (الاحقاف - ٣١)

"আল্লাহর দিকে যে দাওয়াত দিচ্ছে, তার ডাকে সাড়া দাও।" (আহকাফ–৩১)

وَ اَنِيْبُوْٓا اِلٰى رَبِّكُمْ (الزمر - ٥٤)

"তোমরা আপন প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন কর।" (জুমার–৫৪)

এ কথা বলাই বাহুল্য যে, যাকে আল্লাহর আনুগত্য করা ও তার দিকে ছুটে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, সে যদি এ কাজে সক্ষম না হতো, তাহলে নির্দেশ দেওয়া সঠিক হতো না। সেটা হতো একজন পঙ্গু লোককে দৌড়াতে বলার মত।

(৭) যেসব আয়াতে বলা হয়েছে যে, বান্দা এমন সব কাজ করে থাকে, যার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দেননি। যেমনঃ

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ
اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ (النساء - ٦٠)

"তারা খোদাদ্রোহী শক্তির কাছে বিবাদ মীমাংসার জন্য যেতে চেয়েছিল। অথচ সকল খোদাদ্রোহীকে অস্বীকার করতে তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।" (নিসা–৬৯)

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ (الاعراف : ٢٨)

"আল্লাহ কখনো অশ্লীল কার্যকলাপ করার নির্দেশ দেন না।" (আরাফ–২৮)

" وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ (الزمر-٧)

"তিনি তাঁর বান্দাদের কুফরী করা পছন্দ করেন না।" (জুমার-৭)

" وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ (البينة : ٥)

"আল্লাহর ইবাদাত করা ছাড়া তাদেরকে আর কিছু করতে নির্দেশ দেওয়া হয়নি।"(বাইয়েনা-৫)

(৮) যেসব আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষ দুনিয়া ও আখেরাতে নিজের কর্মফল ভোগ করে। যেমনঃ

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ (الروم : ٤١)

"জলে ও স্থলে অরাজকতা ছড়িয়ে পড়েছে মানুষের নিজেরই কর্মের দোষে।" (রুম-৪১)

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ (الشورى : ٣٠)

"তোমাদের ওপর যে আপদই এসে থাকে, তা কেবল তোমাদের কর্মের দোষেইএসেছে।"(শুরা-৩০)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (يونس ٤٤)

"আল্লাহ কখনো মানুষের ওপর জুলুম করেননা, বরং মানুষ নিজেই নিজের ওপর জুলুম করে।" (ইউনুস-৪৪)

وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ (القصص-٥٩)

"জনপদগুলোর অধিবাসীরা জালেম না হলে আমি তা ধ্বংস করতাম না।" (কাসাস-৫৯)

(৯) যেসব আয়াত থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ কাউকে হেদায়াত কিংবা গোমরাহীর জন্য বাধ্য করেন না। বরং মানুষ নিজ ইচ্ছামত দুটোর একটা বেছে নেয়। যেমনঃ

وَاَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنٰهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى (حٰم السجدة)

"এবার সামুদ জাতির কথা শোন। তাদেরকে আমি হেদায়াত করেছিলাম। কিন্তু তারা হেদায়াত পাওয়ার চাইতে অন্ধ হয়ে চলাকেই অগ্রাধিকার দিল।" (হামিম সাজদা- ৩০)

فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ (يونس- ١٠٨)

"যে ব্যক্তি হেদায়াত গ্রহণ করে তার হেদায়াত গ্রহণ করা স্বয়ং তার জন্যই কল্যাণকর।"(ইউনুস-১০৮)

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَىِّ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى (بقره ٢٥٦)

"ইসলামে কোন জোর-জবরদস্তি নেই। কোন্‌টা ন্যায়, কোন্‌টা অন্যায়, তা আলাদা করে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন যে ব্যক্তি খোদাদ্রোহী শক্তিকে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহর ওপর ঈমান আনলো, সে একটা নির্ভরযোগ্য আশ্রয় গ্রহণ করলো।" (বাকারা-২৫৬)

(১০) যেসব আয়াতে নবীগণ আপন ত্রুটি স্বীকার করেছেন এবং তাকে নিজেরই ত্রুটি বলে উল্লেখ করেছেন। যেমনঃ হযরত আদম (আঃ) বলেনঃ

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا (اعراف: ٢٣)

"হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা নিজেদের ওপর জুলুম করেছি।" (আরাফ--২৩)

হযরত ইউনুস (আঃ) বলেনঃ

سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (انبياء- ٨٧)

"তুমি পবিত্র। দোষ তো আমিই করেছি।" (আম্বিয়া–৮৭)

হযরত মূসা (আঃ) বলেনঃ

رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي (قصص-١٦)

"হে পরওয়ারদিগার! আমি নিজের ওপর জুলুম করেছি।" (কাসাস)

হযরত নূহ (আঃ) বলেনঃ

رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ (هود-٤٧)

"হে প্রভু! আমি তোমার কাছে পানাহ চাই, যেন নিজের অজান্তে কোন অন্যায় আবদার তোমার কাছে না করে বসি।" (হুদ–৪৭)

জাবরিয়া মতবাদ

অপরদিকে জাবরিয়া গোষ্ঠীর বক্তব্য এই যে, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হয়না। কোন জিনিসের অস্তিত্বে আসাই হোক, কিংবা তার গুণগত বিবর্তনই হোক আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া হতে পারেনা। তাদের বিশ্বাস এই যে, বিশ্বজগতের প্রতিটি অণুপরমাণুর তৎপরতা ভাগ্যবিধির অধীন সংঘটিত হয়। অস্তিত্ব ও সৃষ্টিতে আল্লাহ ছাড়া আর কোন জিনিসের কোন কার্যকর প্রভাব নেই। কোন কিছুর সৃষ্টিতে আল্লাহর সাথে কেউ শরীক নেই। আল্লাহ যা চান তাই হয়। আর আল্লাহ যা চাননা তা হয়না। আল্লাহর হুকুম ও ফায়সালা ছাড়া কেউ চুল পরিমাণও নড়াচড়া করতে পারেনা। তাঁর কোন কাজকে ভালো বা মন্দ বলে বিবেচনা করা বিবেক–বুদ্ধির অসাধ্য। তিনি যা কিছুই করেন, ভালোই করেন। পৃথিবীতে আমরা যেসব ঘটনাকে কিছু উপকরণের ফল হিসাবে দেখি, তা কেবল বাহ্যতঃ উপকরণের ফল, নচেত প্রকৃতপক্ষে সব

াকছুই আল্লাহ কর্তৃক সংঘটিত হয় এবং আকাশ ও পৃথিবীর ঘটনাবলীর প্রকৃত কর্তা ও সংঘটক তিনিই।

এই মৌলিক আকিদা থেকে একাধিক খুঁটিনাটি আকিদা বেরিয়ে আসে। জুহাম বিন সাফওয়ান এবং শাইবান বিন মুসলিম খারেজীর মত এই যে, মানুষ তার কার্যকলাপে সম্পূর্ণরূপে ভাগ্যের অধীন। তার না আছে ইচ্ছা শক্তি, না আছে বাছ-বিচারের ক্ষমতা। জড় পদার্থ, তরু-লতা এবং অন্যান্য জিনিসের মধ্যে আল্লাহ যেভাবে তৎপরতা ও বিবর্তনের জন্ম দেন, ঠিক তেমনিভাবে মানুষের মধ্যেও কাজের প্রেরণা সৃষ্টি করেন। মানুষের কাজ করা নেহাত রূপক অর্থেই সত্য। এখন প্রশ্ন ওঠে যে, তাহলে শাস্তি ও পুরস্কার কেন? এর জবাব এই যে, কাজে যেমন সে ভাগ্যের অধীন, তেমনি তার পুরস্কার এবং শাস্তিও অদৃষ্ট ঘটিত। অর্থাৎ যেভাবে মানুষ ভাগ্যতাড়িত হয়ে ভালো মন্দ কাজ করে, ঠিক তেমনি ভাগ্য বলেই তার কপালে শাস্তি ও পুরস্কার জোটে। এ হলো নিরেট ও নির্ভেজাল অদৃষ্টবাদ বা অধীনতাবাদ। মুতাজেলাদের কথিত নিরেট স্বাধীনতাবাদের বিপরীত বিন্দুতে এর অবস্থান।

আর একটি গোষ্ঠী রয়েছে। হোসেন নাজার, বাশার বিন গিয়াস আল মিরিসী, যিরার বিন আমর, হাফ্স আল কারদ, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন কাররাম, শোয়েব বিন মুহাম্মাদ আল খারেজী, আব্দুল্লাহ বিন ইববাজ (ইববাজী ফেকার প্রতিষ্ঠাতা) প্রমুখ এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত। এই গোষ্ঠীর মতে, আল্লাহ মানুষের ভালো ও মন্দ যাবতীয় কাজের সৃষ্টিকর্তা ঠিকই, তবে বান্দা এক ধরনের ক্ষমতা ও সাময়িক ইচ্ছাশক্তিরও অধিকারী এবং সেই ক্ষমতা ও ইচ্ছা কিছু না কিছু পরিমাণে তার কার্যকলাপ সংঘটনে কার্যকর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এ জিনিসটা তাদের পরিভাষায় "কাছ্ব" (উপার্জন) নামে অভিহিত। এই উপার্জনের কারণেই বিভিন্ন আদেশ ও নিষেধ মানুষের প্রতি জারি হয়েছে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতেই মানুষ আযাব ও সওয়াবের উপযুক্ত হয়ে থাকে।

ইমাম আবুল হাসান আশয়ারী "উপার্জনের" মতবাদ স্বীকার করেছেন এবং মানুষকে সাময়িক ক্ষমতার অধিকারী বলেও অভিহিত করেছেন। কিন্তু এই ক্ষমতার

কোন কার্যকারিতা স্বীকার করেননি। অর্থাৎ তাঁর মতে, আল্লাহ তাঁর বান্দার দ্বারা যে কাজ সংঘটিত হোক বলে ইচ্ছা করেন, তা বান্দার সাময়িক ক্ষমতা বলে সংঘটিত হয়ে যায়। তবে এই সাময়িক ক্ষমতা আল্লাহর ইচ্ছার বাস্তব রূপ লাভের হাতিয়ার মাত্র। আসলে এই ক্ষমতার এমন কোন সঠিক কার্যকারিতা নেই, যা দ্বারা কাজ সংঘটিত হতে পারে।

কাজী আবুবকর বাকেল্লানী এই মতবাদের সাথে সামান্য দ্বিমত পোষণ করেছেন। তাঁর মতে মানুষের প্রত্যেক কাজের দুটো দিক রয়েছে। একটি দিক দিয়ে বিবেচনা করলে তা একটা কাজ–তা সে ভালো বা মন্দ, পাপ বা পূণ্য যাই হোক। অপর দিক দিয়ে তা একটা গুনাহর কাজ অথবা পূণ্যকর্ম। উদাহরণস্বরূপ নামাজ রোযার কথা ধরা যেতে পারে। এর একটা দিক এই যে, এটা একটা কাজ বা তৎপরতা। অপর দিক দিয়ে এটা একটা ইবাদত। এর প্রথম দিকটা আল্লাহরই কীর্তি। কেননা এটা তাঁরই ক্ষমতা বলে সংঘটিত হয়। অপর দিক দিয়ে তা বান্দার কাজ। কেননা এই দিক দিয়েই একটা কাজ বান্দার সাময়িক ক্ষমতাবলে সংঘটিত হয় এবং এজন্যই সে প্রতিফল পেয়ে থাকে।

আবু ইসহাক ইসফারাইনী এই বক্তব্যের ব্যাপারেও দ্বিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, কাজ নিছক কাজ হিসাবে এবং তার গুণাগুণের বিচারে (অর্থাৎ ভালো বা মন্দ কাজ হিসাবে) এই উভয় হিসাবে একই সাথে আল্লাহর ও বান্দার উভয়ের ক্ষমতাবলে সংঘটিত হয়ে থাকে।

ইমামুল হারামাইন এই উভয় মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেন যে, আল্লাহ বান্দার মধ্যে ক্ষমতা ও ইচ্ছা উভয়ই সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর এই ক্ষমতা ও ইচ্ছার বলেই বান্দা তার আয়ত্তাধীন কাজগুলো সমাধা ও উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে।

সবার শেষে ঈমাম রাজী জাবরিয়া মজহাবের জোরদার ওকালতী করতে এগিয়ে আসেন। তিনি বান্দার ক্ষমতার কোন কার্য্যকারিতা থাকতে পারে এ কথা স্বীকার করেন না। তাঁর মতে "উপার্জন" বলতে কোন জিনিস নেই। আল্লাহই বান্দার সব কাজ সৃষ্টি করেন। ঈমান, কুফরী, আনুগত্য, অবাধ্যতা, হেদায়াত, গোমরাহী

সবই বান্দার মধ্যে আল্লাহ তৈরী করে দেন। তাঁর মতে কারুর দ্বারা কুফরী সংঘটিত হোক–এরূপ ইচ্ছা যদি আল্লাহ করেন তবে তার মুমিন হওয়া অসম্ভব। অনুরূপভাবে আল্লাহর জ্ঞান মোতাবেক কারুর মুমিন হওয়ার কথা থাকলে তার কাফের হওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ কারুর মধ্যে আনুগত্য সৃষ্টি করলে তার অবাধ্য হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। এখন প্রশ্ন জাগে যে, এসব যদি আগে থেকেই স্থির করা হয়ে থাকে এবং তার বিরুদ্ধে চলার ক্ষমতাই বান্দার না থাকে, তাহলে তাকে আদেশ ও নিষেধ করা কিভাবে বৈধ ও যুক্তিসঙ্গত হতে পারে? এর জবাবে ইমাম সাহেব বলেন যে, এটা আল্লাহর জন্য বৈধ। বান্দা মেনে চলতে অক্ষম এমন আদেশ নিষেধও তিনি দিতে পারেন। তাঁর কোন কাজে 'কেন' ও 'কি জন্য' প্রশ্ন উঠতে পারে না।

মোট কথা, আশায়েরা ও তাঁদের সমমতের লোকেরা উপার্জনের সমর্থক হোন বা না হোন, বান্দার কাজ করার সাময়িক ক্ষমতা স্বীকার করুন বা না করুন, তাঁদের যুক্তি–তর্কের মোদ্দা কথা এটাই দাঁড়ায় যে, বান্দার আদৌ কোন স্বাধীন ইচ্ছা ও ক্ষমতা নেই এবং সে যা কিছুই করে ভাগ্যতাড়িত হয়ে বাধ্য হয়েই করে। কারণ আল্লাহ যখন বান্দার স্রষ্টা, তাদের ভালো ও মন্দ কাজ করা না করা তিনিই স্থির করে রেখেছেন। তখন দুই অবস্থার একটা না হয়ে পারে না। বান্দার ভেতরে আল্লাহর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কাজ করার ক্ষমতা থাকবে, অথবা থাকবে না। যদি ক্ষমতা থেকে থাকে, তাহলে আল্লাহর ইচ্ছা ও ক্ষমতার ওপর বান্দার ইচ্ছা ও ক্ষমতার বিজয়ী ও পরাক্রান্ত হওয়া অনিবার্য হয়ে ওঠে। অথচ এটা সর্বসম্মতভাবেই প্রত্যাখ্যাত। আর যদি ধরে নেই যে, ক্ষমতা নেই, তাহলে বান্দার ক্ষমতার নিষ্প্রভ ও নিষ্ফল হওয়া এবং আল্লাহর ইচ্ছার সামনে বান্দার ইচ্ছার অসহায়ত্ব অবধারিত হয়ে ওঠে। এরপর উপার্জন ও সাময়িক ক্ষমতা থাকা না থাকা সমান। এটাই হলো চরম জাবরিয়াত। ভাগ্যের নিগড়ে বান্দার অসহায় বন্দীদশার এটাই চূড়ান্ত রূপ। বস্তুতঃ এ কথা দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, জাবরিয়াত তথা অদৃষ্টবাদের প্রাথমিক মূলনীতিগুলো মেনে নেওয়ার পর কোন ব্যক্তি জাবরিয়াত সংক্রান্ত আকিদার শেষ প্রান্তে না পৌঁছে পারে না। মধ্যবর্তী কোন স্তরে তার থেমে থাকার উপায় নেই।[১]

---

[১] খৃষ্টীয় আকিদা শাস্ত্রবিদদেরও একই অবস্থা। তাদেরও একটি বৃহৎ গোষ্ঠী আশায়েরাদেরই সমমতাবলম্বী। সেন্ট আগাষ্টাইন (St. Augustine) সর্বাত্মক অদৃষ্টবাদ থেকে নিস্তার লাভের অনেক

পবিত্র কুরআন থেকে জাবরিয়াতের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন

মজার ব্যাপার এই যে, মানুষকে অদৃষ্টের হাতের পুতুল বিবেচনাকারী জাবরিয়া গোষ্ঠীও তাদের মতামতের সপক্ষে কুরআন থেকেই প্রমাণ দেখান এবং একটা দুটো নয় বিপুল সংখ্যক আয়াত এমন পেশ করেন, যা

মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতার ধারণার বিরোধী এবং জাবরিয়াত তথা অধীনতাবাদের সমর্থক। যেমন ঃ

যে সমস্ত আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ যাবতীয় শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী, সর্বব্যাপারে ক্ষমতাবান, সকল জিনিসের সৃষ্টিকর্তা। পৃথিবীতে তাঁর অনুমতি ছাড়া কিছুই হয় না।

أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا (بقره - ١٦٥)

চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আল্লাহকে বান্দার কর্মকান্ডের আসল স্রষ্টা এবং বান্দাকে সম্পূর্ণরূপে ভাগ্যচালিত সত্তা বলে মেনে নেওয়ার পর তিনি নিজের চিন্তাধারাকে নিরেট অদৃষ্টবাদের কবল থেকে বাঁচাতে পারেননি। স্কোটাস এরিজিনা (Scotus Erigena) যিনি খৃষ্টীয় আকিদা শাস্ত্রের প্রথম ভিত্তি স্থাপক—আল্লাহকে মানুষের কর্মের স্রষ্টারূপে পরিচয় দিতে গিয়ে সবচেয়ে বেশী বাড়াবাড়ি করেছেন। তাঁর মতে আল্লাহ সমগ্র সৃষ্টি জগতের প্রাণ এবং তিনিই জীবন, শক্তি, জ্যোতি ও বুদ্ধির আকার ধারণ করে বিশ্বের বস্তুনিচয়ের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করছেন। সেন্ট আনসেল্ম (St. Anselm) প্রচলিত খৃষ্টীয় বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে এই মতবাদ প্রচার করেছেন যে, মানুষ জন্মগতভাবেই পাপী। অতঃপর আল্লাহ যিশু খৃষ্টের রূপ ধারণ করে ধরাপৃষ্ঠে আগমন ও মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। এই আকিদায় যে মানুষের অদৃষ্টের কাছে সম্পূর্ণ অসহায় ও অদৃষ্টের লিখন দ্বারা চালিত হওয়ার মতবাদ ছাড়া অন্য কিছুর স্থান নেই, তা সুস্পষ্ট। এবেলার্ড (Abelard) এবং সেন্ট টমাস একুইম (St. Tomus of AQuim) উভয়ে আল্লাহর ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তকে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই এবং ঐ ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ করতে মানুষ মাত্রেই পুরোপুরিভাবে বাধ্য—এই মতের প্রবক্তা। তাঁদের মতে আল্লাহ বান্দার সকল কাজ–কর্মের স্রষ্টা। এমনকি সেন্ট টমাস আশায়েরার এ আকিদাও গ্রহণ করেছেন যে, মানুষ স্বাধীনভাবে কিছু করতে অক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তাকে আদেশ দেওয়া ও নিষেধ করা আল্লাহর পক্ষে বৈধ। খ্যাতনামা খৃষ্টীয় আকিদাশাস্ত্রকারদের মধ্যে একমাত্র ডান্‌স স্কোটাস (Duns Scotus) মুতাজেলাদের মত মানুষের স্বাধীনতার মতবাদে বিশ্বাসী। তাঁর মতে মানুষের ইচ্ছা করা না করা এবং ইচ্ছাকে কর্মে পরিণত করা বা না করার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। আল্লাহর ক্ষমতা মানুষের স্বাধীনতা হরণ করে না।

"যাবতীয় শক্তি–সামর্থ্য ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর।" (বাকারা–১৬৫)

وَمَا هُمْ بِضَارِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ (بقره-١٠٢)

"তারা তাদের যাদু দ্বারা কারোর ক্ষতি করতে সক্ষম ছিল না। তবে আল্লাহর ইচ্ছা থাকলে ভিন্ন কথা।" (বাকারা–১১৩)

اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ (اعراف: ٥٤)

"সাবধান! সৃষ্টি আল্লাহরই এবং হুকুমও তাঁরই চলবে।" (আরাফ–৫৪)

قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (الرعد-١٦)

"তুমি ঘোষণা করে দাও যে, আল্লাহ সকল জিনিসের সৃষ্টিকর্তা, তিনি এক এবং সব কিছুর ওপর পরাক্রান্ত।" (রা'দ–১৬)

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ (الصّٰفّٰت - ٩٦)

"আল্লাহ তোমাদেরকেও সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যা তৈরী কর তাও।" (সাফফাত–৯৬)

(২) যেসব আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক ব্যাপারে আল্লাহর ফায়সালা আগে থেকেই লেখা হয়ে রয়েছে এবং দুনিয়াতে যা কিছুই ঘটে, সেই ফায়সালা মোতাবেকই সংঘটিত হয়।

وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ، وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ
وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖٓ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ (فاطر-٢)

"কোন স্ত্রী জাতীয় প্রাণী এমন কোন গর্ভধারণ করে না, এবং এমন কোন সন্তান প্রসবও করে না, যা আল্লাহর জানা নেই। কোন দীর্ঘজীবীর আয়ু দীর্ঘায়িত হোক বা কারুর আয়ু হ্রাস পাক তা একটি লিপিতে লিখিত থাকেই।" (ফাতের–২০)

وَقَضَيْنَآ إِلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ فِي ٱلْكِتَٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ (بنی اسرائیل-٤)

"আমি কিতাবের মাধ্যমে বনী ইসরাইলকে জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, তোমরা নির্ঘাত দু'বার পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।" (বনী ইসরাইল–৪)

وَمَآ أَصَٰبَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ (آل عمران-١٦٦)

"সংঘর্ষের দিন তোমাদের ওপর যে দুর্যোগ নেমে এসেছিল, তা আল্লাহর ইচ্ছাক্রমেই এসেছিল।" (আল ইমরান–১৪৬)

مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَٰبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ - (الحديد-٢٣)

"পৃথিবীতে কিংবা তোমাদের ওপর এমন কোন বিপদই আসে না, যা আমি সৃষ্টি করার আগেই লিপিবদ্ধ থাকে না।" (হাদীদ–২৩)

(৩) যেসব আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের জন্যই একটা ভাগ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। জীবিকা, সম্মান, ধন–সম্পদ, বিপদ ও শান্তি, জীবন ও মৃত্যু–সবই এই ভাগ্যের অধীন। এতে কম–বেশী হওয়া সম্ভব নয়।

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَٰهُ بِقَدَرٍ (القمر-٤٩)

"আমি প্রতিটি জিনিসকেই একটা পরিকল্পনা মোতাবেক সৃষ্টি করেছি।" (কমর–৪১)

لَهُۥ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ (الشوریٰ-١٢)

"আকাশ ও পৃথিবীর কর্তৃত্বের চাবিকাঠি তাঁরই হাতে নিবদ্ধ। যাকে ইচ্ছ ব্যাপকভাবে জীবিকা দেন আর যাকে ইচ্ছা মাপাজোকা দেন।"(শুরা-১২)

وَلٰكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ (الشورىٰ-٢٧)

"তবে তিনি নিজের ইচ্ছামত পরিকল্পিতভাবে অবতীর্ণ করেন।"(শুরা-২৭)

وَاِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَ
اِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ
مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ (النساء: ٧٨)

"কোন মঙ্গল অর্জিত হলে তারা বলে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। আর কোন দুর্যোগ এলে বলে যে, এটা তোমার কারণে হয়েছে। তুমি বলে দাও যে, সবকিছু আল্লাহর তরফ থেকেই আসে।" (নিসা-৭৮)

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ
سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ (اعراف-٣٤)

"প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর জন্যই একটা মেয়াদ নির্দিষ্ট রয়েছে। সেই মেয়াদ যখন শেষ হয়ে যায়, তখন এক মুহূর্তও আগপাছ হয় না।" (আরাফ–৩৪)

(৪) যেসব আয়াত থেকে জানা যায় যে, বান্দার ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছার অধীন। বান্দার কোনই ক্ষমতা নেই। সকল ক্ষমতা কেবল আল্লাহর। মানুষ যত চেষ্টা–তদবীরই করুক, আল্লাহর সিদ্ধান্ত পাল্টাতে সক্ষম নয়।

وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ (الدهر-٣٠)

"আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তোমরা কিসেরই বা ইচ্ছা করবে?" (আদদাহর–৩০)

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ (آل عمران-١٢٨)

"তোমার হাতে কোনই ক্ষমতা নেই।" (আল ইমরান–১২৮)

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ
اللّٰهُ (كهف - ٢٣)

"কখনো কোন ব্যাপারে এ কথা বল না যে, আমি এটা করবোই। আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তোমার এ কথা কার্যকর হতে পারে না।" (কাহাফ–২৩)

قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلّٰهِ (آل عمران ١٥٤)

"বল যে, যাবতীয় ক্ষমতা কেবল আল্লাহর হাতেই রয়েছে।" (আল ইমরান–১৫৪)

قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ
الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ (آل عمران)

"তুমি বলে দাও যে, তোমরা যদি নিজ নিজ ঘরেও থাকতে, তবুও যাদের ভাগ্যে হত্যা লেখা ছিল, তারা নিজ নিজ হত্যার জায়গায় নিজেরাই উপস্থিত হতো।" (আল ইমরান)

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ
يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ
فَوْقَ عِبَادِهِ (الانعام - ١٧، ١٨)

"আল্লাহ যদি তোমাকে কোন কষ্টে নিক্ষেপ করেন তবে তা হটানোর ক্ষমতা তাঁর ছাড়া আর কারুর নেই। আর যদি তিনি তোমার কোন কল্যাণ করেন, তবে তিনি তো সর্বশক্তিমান। বস্তুতঃ তিনি আপন বান্দাদের ওপর পরাক্রমশালী।" (আনফাল–১৭–১৮)

فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ
تَحْوِيلًا (فاطر - ٤٣)

"অতএব, তুমি আল্লাহর নিয়মে কখনো কোন পরিবর্তনও পাবে না, আর আল্লাহর নিয়মকে বাঞ্চাল হতে কখনো দেখবে না।" (ফাতের-৪৩)

(৫) যেসব আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, হেদায়াত ও গোমরাহী পুরোপুরিভাবে আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি যাকে চান হেদায়াত দান করেন, যাকে চান বিপথগামী ও বিভ্রান্ত করে দেন।

يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا (بقره -)

"আল্লাহ কুরআন দ্বারা অনেককে গোমরাহ করে দেন আবার অনেককে সুপথগামী করেন।" (বাকারা)

مَنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَّشَاْ يَجْعَلْهُ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (الانعام - ٣٩)

"আল্লাহ যাকে খুশী বিপথগামী করেন, যাকে খুশী সরল পথে চালিত করেন।"(আনয়াম-৩৯)

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ (انعام - ١٢٥)

"সুতরাং আল্লাহ যাকে হেদায়াত দিতে চান, ইসলামের জন্য তার বক্ষ খুলে দেন।'(আনয়াম-১২৫)

اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا (نساء - ٨٨)

"আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেছেন তাকে কি তোমরা হেদায়াত করতে চাও? অথচ আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন তার জন্য তোমরা কোন পথ খুঁজে পাবে না।" (নিসা-৮৮)

وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ (مائده - ٤١)

"আল্লাহ যাদেরকে বিভ্রান্তিতে ফেলতে চান, তাকে তুমি আল্লাহর হাত থেকে বাঁচাতে পার না। এরাই সেইসব লোক যাদের মনকে আল্লাহ পবিত্র করতে চাননি।"(মায়েদা–৪১)

وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا

عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ

اللَّهُ (انعام - ١١٢)

"আমি যদি তাদের নিকট কিছু ফেরেশতাও নাজিল করতাম, মৃত লোকেরাও যদি তাদের সাথে কথা বলতো এবং প্রত্যেক জিনিসকে তাদের সামনে মুখোমুখি হাজির করতাম, তবুও তারা আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া ঈমান আনতো না।" (আনয়াম–১১২)

(৬) যেসব আয়াতে বলা হয়েছে যে, সকল লোক ঈমান আনুক এবং মতভেদ না করুক, তা আল্লাহর অভিপ্রেত ছিল না। নচেত আল্লাহর ইচ্ছা থাকলে সবাই ঈমান আনতো এবং কোন বিতর্ক অবশিষ্ট থাকতো না।

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (بقره - ٢٥٣)

"আল্লাহ যদি চাইতেন তবে তারা লড়াই করতো না। আসলে আল্লাহ যা চান তা করেই ছাড়েন।" (বাকারা–২৫৩)

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا

أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۝ وَمَا كَانَ

لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (يونس - ٩٩)

"তোমার প্রতিপালক যদি চাইতেন তবে পৃথিবীতে যত লোক রয়েছে, তারা সবাই ঈমান আনতো। তাহলে তুমি কি মানুষকে ঈমান আনতে বাধ্য করতে চাও? আসলে তো আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোন প্রাণী মুমিন হতে পারে না।" (ইউনুস–৯৯)

যেসব আয়াতে বলা হয়েছে যে, দোজখের জন্যই অনেককে সৃষ্টি করা হয়েছে, সেগুলোও এই শ্রেণীভুক্ত। যেমনঃ

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ (اعراف ۱۷۹)

"আমি বনু জিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্যই সৃষ্টি করেছি।" (আরাফ–১৭৯)

(৭) যেসব আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ কাফের ও মোনাফেকদেরকে ঈমান আনা ও নেক আমল করা থেকে ফিরিয়ে রেখেছেন এবং এ ধরনের লোকেরা হেদায়াত পেতেই পারেনা। কিন্তু সেই সাথে এ কথাও বলা হয়েছে যে, তাদেরকে আল্লাহর যাবতীয় আদেশ নিষেধ মেনে চলার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে এবং অবাধ্যতা ও বিদ্রোহের জন্য তাদেরকে আযাবের হুমকি দেওয়া হয়েছে।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ
تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ
سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ
عَظِيمٌ (بقره ۶-۷)

"বস্তুতঃ যারা কুফরীতে লিপ্ত তাদেরকে তুমি ভীতি প্রদর্শন কর বা না কর, তাদের জন্য দুটোই সমান। তারা কোন অবস্থাতেই ঈমান আনেনা। আল্লাহ তাদের মনের ওপর ও কানের ওপর মোহর মেরে দিয়েছেন। তাদের চোখের ওপরও পর্দা পড়ে রয়েছে। আর তাদের জন্য ভয়াবহ শাস্তি রয়েছে।" (বাকারা–৬–৭)

فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا (بقره ۱۰)

"তাদের অন্তরে রোগ রয়েছে। আল্লাহ তাদের রোগ আরো তীব্র করে দিয়েছেন।"(বাকারা–১০)

وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا - (انعام ٢٥)

"আমি তাদের হৃদয়ের ওপর পর্দা দিয়ে রেখেছি। এতে তাদের কুরআন বুঝার পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। এছাড়া তাদের কানকেও ভারী করে দিয়েছি।" (আনয়াম্–২৫)

وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ (التوبہ - ٤٦)

"কিন্তু আল্লাহ তাদের জাগরণকে পছন্দ করেননি। তাই তিনি তাদেরকে শিথিল করে দিয়েছেন।" (তওবা– ৪৬)

وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (اعراف - ١٠٠)

"আর আমি তাদের মনের ওপর সিল মেরে দেই। ফলে তারা শুনতে পায়না।" (আরাফ–১০০)

(৮) যেসব আয়াত থেকে জানা যায় যে, কাফেরদেরকে যেসব অপকর্মের দরুন দুনিয়া ও আখেরাতে শাস্তি দেওয়া হয়, তা আল্লাহরই ইচ্ছা ও নির্দেশক্রমে তাদের দ্বারা সংঘটিত হয়।

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا - (بنی اسرائیل - ١٦)

"আমি যখন কোন জনপদকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নেই, তখন সেই জনপদের বিত্তশালীদেরকে পাপাচারে লিপ্ত হবার নির্দেশ দেই, অমনি তারা পাপাচারে লিপ্ত হয়।" (বনী ইসরাইল–১৬)

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا (انعام-١٢٣)

"আমি এভাবেই প্রত্যেক জনপদে সেখানকার বড় বড় দুষ্কৃতিকারীকে চক্রান্ত করার জন্য নিয়োজিত রেখেছি।" (আনয়াম–১২৩)

زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ۝ (النمل-٤)

"তাদের (খারাপ) কাজগুলোকে আমি মোহনীয় বানিয়ে রেখেছি। ফলে তারা উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।" (নাম্‌ল–৪)

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ

"তুমি সেই ব্যক্তির কথা শুনোনা যাকে আমি আমার স্মরণ থেকে উদাসীন করে দিয়েছি এবং যে আপন প্রকৃতির অনুসরণ করে।" (কাহফ–২৮)

(৯) যেসব আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ স্বয়ং গোমরাহকারী শয়তান ও অসৎ নেতাদের আধিপত্য মানুষের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন, এবং তারা তাদেরকে কুপ্ররোচনা দিতে থাকে।

أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا ۝ (مريم-٨٣)

"দেখতে পাওনা যে আমি শয়তানদেরকে ঐসব কাফেরের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি, এবং তারা তাদেরকে ভালোমত আস্কারা দিচ্ছে?" (মরিয়ম–৮৩)

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ (قصص-٤١)

"আর আমি তাদেরকে আগুনের দিকে আহবানকারী নেতা বানিয়েছি।" (কাসাস–৪১)

وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ (حم السجدة-٢٥)

"আর আমি তাদের জন্য এমন সাথী নিয়োগ করেছি যারা তাদের সামনের ও পেছনের জিনিসগুলোকে তাদের জন্য চিত্তাকর্ষক বানিয়ে দেয়।" (হামিম সিজদা–২৫)

আকিদা শাস্ত্রবিদদের ব্যর্থতা

ইসলামী আকিদা শাস্ত্রকারদের এই উভয় গোষ্ঠীর যুক্তিতর্ক দেখে স্পষ্টতঃই বুঝা যায় যে, অদৃষ্ট সংক্রান্ত সমস্যা নিরসনে উভয় গোষ্ঠীই ব্যর্থ হয়েছেন। কিন্তু তাঁদের এই ব্যর্থতার কারণ এটা নয় যে, তাঁরা কুরআন থেকে দিকনির্দেশনা লাভ করতে চেয়েছেন, কিন্তু কুরআন তাঁদেরকে হেদায়াত দান করেনি। বরং এর কারণ এই যে, তাঁরা কুরআন থেকে হেদায়াত না চেয়ে দার্শনিক প্রক্রিয়ায় চিন্তা-গবেষণা চালিয়েছেন এবং দুটো বিপরীতমুখী ধারণার একটাকে গ্রহণ করেছেন। অতঃপর নিজেদের ধারণার সমর্থনে প্রমাণ অন্বেষণের জন্য কুরআন অধ্যয়ন করেছেন। যে আয়াত যার মতলব সিদ্ধির সহায়ক বলে মনে হয়েছে, সে আয়াতকে সে নিজের খেয়াল-খুশীমত বিশ্লেষণ করেছে। উভয় গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে যে আয়াতগুলো উপস্থাপিত করা হয়েছে, তাতো ওপরে দেখলেন। কতিপয় আয়াত দ্ব্যর্থহীনভাবে মানুষের স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার পক্ষে রায় দেয় এবং সেগুলো থেকে মানুষের অদৃষ্টের অধীন হওয়ার তত্ত্ব প্রমাণিত হয়না। কিন্তু তা সত্ত্বেও জাবরিয়া তথা অদৃষ্টবাদীরা ইনিয়ে বিনিয়ে তার এমন ব্যাখ্যা দেয়, যা সুস্থ বিবেক কিছুতেই মেনে নেয়না। কাদরিয়া বা স্বাধীনতাবাদীদের অবস্থাও তদ্রুপ। যেসব আয়াত অকাট্যভাবে এ তত্ত্ব প্রকাশ করে যে, মানুষের ভাগ্য নির্ধারিত রয়েছে এবং তার বিপরীত চলার কোন ক্ষমতাই তার নেই, সেসব আয়াতকেও কাদরিয়া গোষ্ঠী নিজেদের মতবাদের সমর্থক বলে দেখাতে চেষ্টা করে এবং এজন্য তারা ইনিয়ে বিনিয়ে যে ব্যাখ্যা দেয়, তাতে আয়াতের শব্দার্থের দিকেও তারা ভ্রুক্ষেপ করেনা। এর ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, যে ব্যক্তি আগে থেকেই নিজের আকিদা স্থির করে রেখেছে এবং কুরআন থেকে শুধু তার সমর্থন খোঁজে, কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিই উভয় পক্ষের যুক্তি- তর্কে সন্তুষ্ট হতে পারে। নচেত যে ব্যক্তি আগে থেকে কোন বিশ্বাস মনে বদ্ধমূল করে নেয়নি এবং কুরআন অধ্যয়ন দ্বারাই একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ইচ্ছা রাখে, সে জাবরিয়া ও কাদরিয়া কোন পক্ষেরই যুক্তিতর্কে সন্তুষ্ট হতে পারেনা। বরং সে যদি খোদ কুরআন সম্পর্কেই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে, তবে তাও বিচিত্র কিছু নয়। উভয় পক্ষ যেভাবে কুরআনের আয়াত নিয়েই দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছে এবং এসব আয়াত দ্বারা সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী আকিদার পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছে, তা দেখে একজন অজ্ঞ মানুষও এ কথা না ভেবে পারেনা যে, স্বয়ং কুরআনের বক্তব্যই স্ববিরোধিতায় পরিপূর্ণ (নাউজুবিল্লাহ)।

তাকদীর সমস্যার গ্রন্থী উম্মোচন

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে এ কথা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, মানুষ এ যাবত তাকদীরের রহস্য উন্মোচনের যত চেষ্টা করেছে, তার সবই ব্যর্থ ও নিষ্ফল হয়েছে। এ ব্যর্থতার একমাত্র কারণ এই যে, এই বিশাল প্রাকৃতিক রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা এবং আল্লাহর এই বিরাট বিশ্বসাম্রাজ্যের পরিচালনার মৌলিক বিধান অবগত হওয়ার উপায়-উপকরণ মানুষের নাগালের বাইরে। আমাদের সামনে একটি বিশাল কারখানা চালু রয়েছে এবং আমরা তার একটি নগণ্য যন্ত্রাংশ মাত্র। শুধু এতটুকুই আমরা জানি। যে শক্তিগুলো এ কারখানা পরিচালনা করছে এবং যে শক্তিগুলোর অধীন এর যাবতীয় কাজ পরিচালিত হচ্ছে, তার নাগাল পাওয়ার কোন উপায়-উপকরণ আমাদের কাছে নেই। আমরা না পারি আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা তা অনুভব করতে, আর না পারি আমাদের বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা তার রহস্য উপলব্ধি করতে। অনুভূতি ও উপলব্ধির নাগালের বাইরের বিষয়গুলো তো পরের কথা, সৃষ্টি জগতের যে সকল জিনিস অনুভূতি ও উপলব্ধির সীমার ভেতরে অবস্থিত, আমরা তো তাও এখনো আয়ত্তে আনতে পারিনি। আমরা আমাদের ইন্দ্রিয় দ্বারা এ যাবত যা কিছু অনুভব করতে পেরেছি এবং আন্দাজ-অনুমান ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা দ্বারা যা কিছু আমরা জানতে পেরেছি, তা সৃষ্টি জগতের অথৈ সমুদ্রে এক বিন্দুর চেয়ে বেশী নয়। অন্য কথায় বলা যায়, আমাদের জ্ঞান এবং জ্ঞান আহরণের উপায়-উপকরণের সাথে আমাদের অজ্ঞতা ও অজ্ঞতার কারণগুলোর সম্পর্ক অসীমের সাথে সসীমের সম্পর্কের মতই। এমতাবস্থায় প্রকৃতির এই সীমাহীন কারখানার অভ্যন্তরে কি ধরনের রহস্যময় জগত লুকিয়ে রয়েছে এবং তার ভেতরে আমাদের সত্যিকার অবস্থান কি, সেটা উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। জ্ঞানার্জনের জন্য আমাদের নিজস্ব যে উপায়-উপকরণ রয়েছে, তার দ্বারা এ রহস্য উপলব্ধি করার তো প্রশ্নই ওঠেনা। এমনকি আল্লাহ স্বয়ং যদি আমাদের কাছে এগুলো বর্ণনা করতেন,

তবুও আমাদের সীমাবদ্ধ বিবেক–বুদ্ধি দ্বারা সেই তত্ত্ব আমরা অনুধাবন করতে পারতামনা।

এবার আমাদের মূল প্রশ্নে ফিরে যাওয়া দরকার। প্রশ্নটা ছিল এই যে, কুরআনে তাকদীর তত্ত্ব সম্পর্কে আভাস– ইংগীতে যে কথাগুলো বলা হয়েছে, তাতে আপাতঃদৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী তথ্যাবলীর সমাবেশ পরিলক্ষিত হয়। কোথাও বলা হয়েছে যে, বান্দা স্বয়ং তার কর্মকান্ডের কর্তা এবং এর ভিত্তিতেই ভালো–মন্দের বাছ–বিচার করে শাস্তি ও পুরস্কারের বিধান ঘোষণা করা হয়েছে। কোথাও বলা হয়েছে যে, বান্দার কোনই কর্মক্ষমতা নেই, তার যাবতীয় কর্মকান্ডের আসল কর্তা স্বয়ং আল্লাহ। কোথাও আল্লাহ ও বান্দা উভয়কে একই কর্মের কর্তা বলে অভিহিত করা হয়েছে। কোথাও বান্দাকে হেদায়েত গ্রহণ ও গোমরাহী থেকে বেরিয়ে আসার আহ্বান এমনভাবে জানানো হয়েছে যেন গ্রহণ ও বর্জনের ক্ষমতা তার রয়েছে। কোথাও বলা হয়েছে যে, হেদায়াত ও বিভ্রান্তি আল্লাহর তরফ থেকেই আসে এবং আল্লাহই কাউকে সোজা পথে চালান এবং কাউকে পথভ্রষ্ট করে দেন। কোথাও বলা হয়েছে যে, বান্দা স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অধিকারী। আবার কোথাও বলা হয়েছে যে, বান্দার ইচ্ছা মূলতঃ আল্লাহরই ইচ্ছা। কোথাও পাপ ও নাফরমানীর জন্য বান্দাকে দায়ী করা হয়েছে। আবার কোথাও এর সংঘটক বলা হয়েছে শয়তানকে। কোথাও বলা হয়েছে যে, ভালো–মন্দ সবই আল্লাহর পক্ষ থেকেই সংঘটিত হয়ে থাকে। কোথাও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ করতে না দিলে কেউ কিছু করতে পারে না। আবার কোথাও অবাধ্য মানুষকে এই বলে দোষারোপ করা হয়েছে যে, সে আল্লাহর হুকুম অমান্য করেছে। যদি এসব উক্তি পরস্পর বিরোধী হয়ে থাকে, যেমন আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয়, তাহলে এতসব বিপরীতমুখী উক্তি সম্বলিত কিতাবকে আমরা আল্লাহর কিতাব বলে কিভাবে মানতে পারি? আর যদি এগুলোর বৈপরীত্য ও স্ববিরোধিতা স্বীকার করা না হয়, তাহলে এগুলোর মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধানের উপায় কি, তা ব্যাখ্যা করা জরুরী।

অতি প্রাকৃতিক ও ইন্দ্রিয়াতীত তথ্যাবলী বর্ণনার পেছনে কুরআনের আসল অভিপ্রায়

উপরোক্ত প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা–ভাবনা করার আগে যে বিষয়টা হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন তা এই যে, কুরআনে শুধু তাকদীর বা অদৃষ্ট সম্পর্কে নয় বরং পঞ্চেন্দ্রিয়ের ধরা–ছোঁয়ার বাইরের বিষয়গুলোর প্রতি যে আভাস–ইংগিত দেওয়া হয়েছে, তার আসল উদ্দেশ্য ঐ সকল বিষয়ের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন ও আল্লাহর রাজ্যের যাবতীয় রহস্য উদঘটিত করা নয়। কেননা প্রথমতঃ এই বিস্তৃত বিশ্বনিখিলের পাতায় পাতায় যে মহাসত্যগুলো লিখিত রয়েছে, তা সবিস্তারে কোন পুস্তকে লিপিবদ্ধ করার স্থান সংকুলান যেমন সম্ভব নয়, তেমনি তা লিখে বা পড়ে শেষ করার সাধ্যও কারুর নেই। এতসব বিস্তারিত সৃষ্টিতত্ত্ব লেখার জন্য এক সীমাহীন খাতার প্রয়োজন, তা পড়ে শেষ করার জন্যও চাই এক অনাদি অনন্ত জীবন, তা বর্ণনা করার জন্য চাই অনুচ্চারিত বুদ্ধিবৃত্তিক ভাষা, আর তা শ্রবণের জন্য চাই নিঃশব্দ বুদ্ধিদীপ্ত শ্রবণশক্তি।

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ
أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ۝ (كهف ١٠٩)

"হে নবী। তাদেরকে বল যে, সমুদ্র যদি আমার প্রভুর কথাগুলো লেখার জন্য কালি হয়ে যেত, তবে তাও কথাগুলো লিখে শেষ করার আগে ফুরিয়ে যেত, এমনকি যদি তার সাহায্যার্থে আরো এক সমুদ্রসম কালি আনতাম, তবুও তা লিখে শেষ করা যেতনা।" (কাহাফ–১০৯)

দ্বিতীয়তঃ সমস্ত সৃষ্টিতত্ত্ব যদি সবিস্তারে বর্ণনা করাও হতো, তবে, আগেই বলা হয়েছে যে, মানুষকে যে সীমাবদ্ধ মেধা ও বোধশক্তি দান করা হয়েছে, তা দ্বারা সে তা বুঝতে সক্ষম হতোনা। মানুষের বোধ শক্তির অবস্থা এই যে, এরিষ্টটল ও পিথাগোরাসের আমলে যদি কেউ বিংশ শতাব্দীর টেলিফোন, সিনেমা, রেডিও, উড়োজাহাজ ইত্যাদির বিবরণ দিত, তাহলে যাদেরকে আজও বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী বলে বিবেচনা করা হয়, তারাই তাকে পাগল ঠাওরাতো। আর আজ থেকে হাজার বছর পরে পৃথিবীতে যেসব নতুন নতুন জিনিসের উদ্ভব হবে, তার ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ যদি আজ এই বিংশ শতাব্দীতে করা হয়, তবে আমাদের বড় বড় বিজ্ঞানী ও দার্শনিক

পর্যন্ত তা বুঝতে পারবেনা। যেসব জিনিস জানা ও বুঝার ক্ষমতা মানুষের মধ্যে সুপ্ত রয়েছে, কেবল সক্রিয় হওয়া বাকী, সেগুলোর অবস্থাই এরূপ। আর যেসব জিনিসের জানা ও বুঝার ক্ষমতাই তার নেই এবং যার কল্পনা করাও তার অসাধ্য, তা বর্ণনা করে কি লাভ হতো? এ জন্যই কুরআনে বলা হয়েছে যেঃ

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ
مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ
(بقره-٢٥٥)

"মানুষের সামনে এবং পেছনে যা কিছু রয়েছে, তা সবই তিনি জানেন। কিন্তু তাঁর জানা কোন জিনিসই তাদের আয়ত্তাধীন নয়, কেবল আল্লাহ স্বয়ং তাদেরকে যা কিছু জানাতে চান, তার কথা আলাদা। আকাশ ও পৃথিবীর সর্বত্র তাঁর ক্ষমতা বিস্তৃত।"(বাকারা–২৫৫)

অতএব, এ ধরনের বিষয়গুলোর প্রতি কুরআনে যেসব আভাস–ইংগিত দেওয়া হয়েছে, তা গোপনীয় তথ্য জানানোর জন্য নয় বরং মানুষের নৈতিক ও বাস্তব স্বার্থসংশ্লিষ্ট লক্ষ্য সমূহ অর্জনে সহায়তা করার জন্য। অবশ্য কোথাও কোথাও এর মাধ্যমে সুক্ষ্মদর্শী ও উচ্চ অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন লোকদেরকে অল্পবিস্তর ঐশী গোপন রহস্যও অবগত করা হয়। আবার কোথাও কোথাও বর্ণনা পরম্পরা ও আলোচ্য বিষয়ের দাবীতেও এ ধরনের আভাস–ইংগিত দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। গভীর ও সুষ্ঠু চিন্তা–ভাবনা দ্বারা এর কিছু না কিছু তাৎপর্য আমরা বুঝতে পারি।

তাকদীর তত্ত্ব বর্ণনা করার উদ্দেশ্য

এ আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, তাকদীরের বিষয়ে কুরআনে যেসব আভাস দেওয়া হয়েছে, তার উদ্দেশ্য আমাদের যা আদৌ বুঝবার যোগ্যতা ও ক্ষমতা নেই, তা জানানো নয়। আসল উদ্দেশ্য শুধু এতটুকু যে, মানুষের মধ্যে অল্পে তুষ্টি, একাগ্রতা, আল্লাহর ওপর নির্ভরতা, ধৈর্য ও স্থিতি এবং পার্থিব শক্তিগুলোর ব্যাপারে নির্ভীকতা সৃষ্টি করতে হবে। তাকে এমন নৈতিক গুণে সমৃদ্ধ করতে হবে যাতে হতাশা, উদ্বেগ–উৎকণ্ঠা, ভীতি, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা ও লোভ–লালসা তার ধারে–কাছে ঘেঁষতে না পারে। তাকে এতটা চারিত্রিক শক্তিতে বলিয়ান করতে হবে যাতে সে সত্য, ন্যায়নীতি ও সৎকর্মের ওপর বহাল থাকে, তার প্রতি অন্যদেরকে দাওয়াত দিতে পারে, এরজন্য কঠোরতর বাধা–বিঘ্নের মোকাবিলা করতে পারে, এ পথে যত কঠিন পরীক্ষা আসুক, তাতে অবিচল থাকতে পারে, আল্লাহ ছাড়া আর কারুর দ্বারা কোন ক্ষয়–ক্ষতির আশংকা ও বিন্দু পরিমাণ লাভের আশা না করে, অভাবে হতোদ্যম ও প্রাচুর্যে গর্বিত বা মাত্রাতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী না হয় এবং ব্যর্থতায় ভগ্নোৎসাহ ও সাফল্যে অহংকারী নাডড হয়। উদাহরণস্বরূপ, নিম্নের আয়াতগুলোতে আসল উদ্দেশ্য কিভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে তা লক্ষণীয়।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ
كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ
ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا (بقره-١٦٥)

"এমন অনেক মানুষ রয়েছে যারা অন্যদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ বানায় এবং তাদেরকে এত ভালোবাসে যেমন আল্লাহকে ভালোবাসা উচিত। অথচ মুমিনরা আল্লাহকেই সবচেয়ে বেশী ভালোবাসে। আজাব প্রত্যক্ষ করার সময় যে আল্লাহই সর্বশক্তিমান বলে মনে হবে, সেটা যদি জালেমরা আগেই বুঝতে পারতো, তবে কতই না ভলো হতো।" (বাকারা–১৬৫)

يَآيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ٥ (فاطر-١٥)

"হে মানব সন্তান। তোমরা সবাই আল্লাহর মুখাপেক্ষী। আর আল্লাহই একমাত্র অভাব শূন্য এবং সর্বগুণ সম্পন্ন।" (ফাতের–১৫)

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ٥ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا ٥ (المزمل)

"আপন প্রতিপালকের নাম নাও এবং সবাইকে বর্জন করে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ কর। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অধিপতি। তিনি ছাড়া আর কেউ আনুগত্য লাভের যোগ্য নয়। অতএব তুমি একমাত্র তাঁকেই নিজের সর্বময় ব্যবস্থাপক মেনে নাও।" (মুজাম্মেল–৯)

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ (البقره-١٠٧)

"তুমি কি জান না যে, আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্বের সর্বময় মালিক আল্লাহ এবং তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন রক্ষক ও সাহায্যকারী নেই। ?" (বাকারা–১০৭)

اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِيْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهٖ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ٥ (آل عمران - ١٦٠)

"আল্লাহ যদি তোমাদেরকে সাহায্য করেন তাহলে তোমাদের ওপর বিজয়ী হতে পারে এমন কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমাদেরকে লাঞ্ছিত করেন তাহলে তার পরে আর কে তোমাদের সাহায্য করতে পারে? মুমিনদের কেবল আল্লাহর ওপরই নির্ভর করা উচিত।" (আল ইমরান–১৬০)

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَ
وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَ
تُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيْرٌ (اٰل عمران - ٢٦)

"বল, হে আল্লাহ! রাজ্যের অধিপতি! তুমি যাকে চাও, রাজ্য দিয়ে থাক, যার চাও রাজ্য ছিনিয়ে নাও, যাকে ইচ্ছা সম্মান দাও, যাকে ইচ্ছা অপমানিত কর, যাবতীয় কল্যাণ একমাত্র তোমার হাতে। তুমিই সর্বশক্তিমান।" (আল ইমরান–২৬)

قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ
وَاسِعٌ عَلِيْمٌ يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ (اٰل عمران ٧٣-٧٤)

"বল যে, মর্যাদা আল্লাহর হাতে রয়েছে। যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন। আল্লাহ অত্যন্ত উদারচেতা ও মহাজ্ঞানী। যাকে পছন্দ করেন আপন অনুগ্রহ দ্বারা বিশেষভাবে অভিষিক্ত করেন।" (আল ইমরান–৭৩–৭৪)

لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ
يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (الشورٰى-١٢)

"আকাশ ও পৃথিবীর চাবিকাঠি তাঁরই হাতে। যাকে ইচ্ছা মুক্ত হস্তে জীবিকা দান করেন। আর যাকে ইচ্ছা পরিমিতভাবে দেন। তিনি প্রতিটি জিনিস সম্পর্কে অবগত।"(শুরা–১২)

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ (النحل-٧١)

"একমাত্র আল্লাহই জীবিকার ব্যাপারে তোমাদের একজনকে অপর জনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।" (নাহল–৭১)

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ وَ

إِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَنْ
يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ (يونس-١٠٧)

"আল্লাহ যদি তোমার ক্ষতি করেন তবে সেই ক্ষতির প্রতিকারও তিনি ছাড়া আর কেউ করতে পারে না। আর তিনি যদি তোমার কল্যাণ চান তবে তাঁর অনুগ্রহ প্রতিরোধ করার মত কেউ নেই। আপন বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে খুশী তিনি লাভবান করেন। বস্তুতঃ তিনিই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।" (ইউনুস-১০৭)

وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ط (بقره-١٠٢)

"তারা আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কাউকে যাদু দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে না।" (বাকারা-১০২)

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى
اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (توبہ-٥١)

"বল যে, আমাদের ভাগ্যে আল্লাহ যা লিখে রেখেছেন, তাছাড়া আর কোন বিপদ-মুসিবত আমাদের ওপর কখনো আসতে পারে না। তিনিই আমাদের সহায়। ঈমানদারদের কেবল আল্লাহর ওপরই ভরসা করা কর্তব্য।" (তাওবা-৫১)

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا
(آل عمران-١٤٥)

"আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া কারোর মরার সাধ্য নেই। মৃত্যুর সময় নির্ধারিত এবং আগে থেকে স্থিরকৃত রয়েছে।" (আল ইমরান-১৪৫)

يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا
هَاهُنَا ۗ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ
عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ ۚ (آل عمران-١٥٤)

"তারা বলে থাকে যে, আমরা যদি কিছু কলা-কৌশল খাটাতে পারতাম তাহলে এখানে খুন হতাম না। তুমি বলে দাও যে, তোমরা যদি তোমাদের বাড়ীতেও থাকতে, তবুও যাদের খুন হওয়া ভাগ্যে লেখা ছিল, তারা নিজ নিজ নিহত হওয়ার জায়গায় নিজেই বেরিয়ে আসতো।" (আল ইমরান-১৫৪)

সুতরাং তাকদীরে বিশ্বাস রাখার যে শিক্ষা কুরআনে দেওয়া হয়েছে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ যেন দুনিয়ার কোন শক্তিকে লাভ ও ক্ষতির মালিক মনে না করে, বরং কেবলমাত্র আল্লাহকেই যেন সকল কর্মের কর্তা, একমাত্র কার্যকর প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী এবং লাভ ও ক্ষতির একমাত্র মালিক বলে বিশ্বাস করে। সে যেন সকল ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহর ওপরই নির্ভর করে। কোন সৃষ্টির সামনে নতি স্বীকার না করে। আর যদি সুখ-শান্তি লাভ করে তবে যেন দাম্ভিক না হয়। অহংকারী ও অবাধ্য না হয়।

সূরা হাদীদের তৃতীয় রুকুতে এ কথাই বলা হয়েছে ঃ

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا
فِىْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ
لِّكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰكُمْ وَاللّٰهُ
لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ۝ (الحديد-٢٣)

"পৃথিবীতে কিংবা স্বয়ং তোমাদের ওপর যে দুর্যোগই আসে, তা তার সৃষ্টির আগেই লিপিবদ্ধ করা থাকে। আল্লাহর পক্ষে এটা সহজ ব্যাপার। তোমাদেরকে এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা যেন ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিচলিত না হও এবং আল্লাহ কোন কিছু দান করলে গর্বিত না হও। আল্লাহ কোন অহংকারী ও দাম্ভিককে পছন্দ করেন না।" (হাদীদ-৬৩)

বাস্তব জীবনে তাকদীর বিশ্বাসের উপকারিতা

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের জীবনের প্রতিটি কাজে এই মানসিকতা ও প্রেরণা সৃষ্টিরই চেষ্টা করতেন। কেননা এতে চরিত্রের ওপর

বিশেষ প্রভাব পড়ে। মানুষের মনে যদি এ আকিদা বদ্ধমূল হয়ে যায় তাহলে বড় বড় রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা আপনা থেকেই সমাধান হয়ে যায়। এমনকি সমস্যার সৃষ্টিই হয় না। উদাহরণস্বরূপ দুটো হাদীস লক্ষ্য করুনঃ

হযরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا

"কোন মহিলার পক্ষে এটা বৈধ নয় যে, সে তার অপর বোনকে (সতীন) তালাক দেওয়ার দাবী জানাবে, যাতে তার নিজের অধিকার ও ভোগবিলাসে অন্য কেউ ভাগ না বসায় এবং জীবিকার পেয়ালা সে একচেটিয়াভাবে ভোগ করতে পারে। কেননা তার জন্য যা বরাদ্দ করা রয়েছে. সে কেবল তাই ভোগ করতে পারবে।" [১]

অন্য একটি হাদীসে আবু সাইদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক যুদ্ধে বহু সংখ্যক দাসী আমাদের হস্তগত হলো। আমরা তাদেরকে ভোগ করলাম। কিন্তু পাছে গর্ভে সন্তান জন্মে যায় এই আশংকায় আমরা আজল করতে লাগলাম। [২] অতঃপর আমরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, কাজটা সঙ্গত হচ্ছে কি না। তিনি শোনা মাত্রই বললেনঃ أَوَ إِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ؟ "তোমরা কি সত্যিই এ রকম করছ?" তিনি তিনবার প্রশ্নটি করলেন। অতঃপর বললেন ঃ مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ

---

[১] বোখারী, বিয়ে সংক্রান্ত অধ্যায়, বিয়ের ব্যাপারে যেসব শর্ত আরোপ করা জায়েজ নয় তার বিবরণ। বায়হাকী ও আবু নাঈম ইসফাহানী প্রায় এই মর্মেই একটি হাদীস ভিন্ন সনদে বর্ণনা করেছেন। আল্লামা ইবনে আব্দুল বার বলেন যে, তাকদীর বিষয়ে বর্ণিত সকল হাদীসের মধ্যে এটি শ্রেষ্ঠ। এর তাৎপর্য এই যে, স্বামী যদি স্ত্রীর দাবী মেনেও নেয় এবং অপর স্ত্রীকে তালাক দেয়, যার সম্পর্কে তার ধারণা এই যে, সে তার জীবিকার ভাগ বসাবে, তাহলেও তাতে কোন ফায়দা হবেনা। আল্লাহ তার জন্য যতটুকু বরাদ্দ করেছেন, তারচেয়ে বেশী কিছু সে পাবেনা, চাই স্বামী তার শর্ত গ্রহণ করুক বা না করুক।

[২] সহবাসকালে স্ত্রী অঙ্গের বাইরে বীর্যপাত করাকে আজল বলা হয়।

"কেয়ামত পর্যন্ত যত সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া নির্ধারিত রয়েছে। তারা ভূমিষ্ঠ হবেই" ৩·

এই দুটো হাদীসে যে মূলনীতিগুলো বর্ণনা করা হয়েছে তাকে একটু সম্প্রসারিত করে আমরা যদি আমাদের জীবনের কর্মকান্ডে বাস্তবায়িত করি, তাহলে যে অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব–সংঘাত ও প্রতিযোগিতা মানব জাতির সুখ ও শান্তি কেড়ে নিয়েছে, তা অতি দ্রুত সমাধান হয়ে যেতে পারে। কেউ কাউকে যেমন আপন জীবিকা হরণকারী ভাববেনা, তেমনি আপন জীবিকার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কারুর সাথে সংঘাতে লিপ্ত হবে না। শ্রমিক–পুজিপতির দ্বন্দ্বের প্রশ্ন উঠবে না। কৃষক–জমিদারের মধ্যেও সংঘাত সৃষ্টি হবে না। ক্রুগার, জোহারুফ, লেনিন, স্ট্যালিনও জন্ম নেবে না, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য গর্ভপাত ও গর্ভরোধের ব্যবস্থা করা হবে না। আল্লাহর ব্যবস্থাপনায় সংশোধনের ধৃষ্টতাও দেখানো হবে না।

এ ধরনের অসংখ্য বাস্তব ও নৈতিক উপকারিতা তাকদীরের ইসলামী শিক্ষা থেকে অর্জিত হয় এবং এটাই ছিল তার আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমরা তার বাস্তব ও নৈতিক সার্থকতা ও উপকারিতার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে তার দার্শনিক তত্ত্বের দিকে মনোনিবেশ করেছি। অতঃপর মানবরচিত মতাদর্শের দরুণ আমরা যে সব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি, নিজেদের অভিরুচি অনুসারে আল্লাহ ও রসূলের কালাম দ্বারা তার সমাধান করা শুরু করে দিয়েছি। অথচ কুরআন আমাদেরকে অতিপ্রাকৃতিক তথা ইন্দ্রিয়াতীত তত্ত্ব ও তথ্য শিক্ষা দেওয়ার জন্য নাজিল হয়নি। রসূলও (সাঃ) দর্শনের অধ্যাপনা করার জন্য আসেননি। আমরা আমাদের জীবনের বাস্তব সমস্যাবলী বাদ দিয়ে দুনিয়া ও আখেরাতে আদৌ লাভজনক নয় এমন সব ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করে দেই–এটা কখনো আল্লাহ ও রসূলের অভিপ্রেত ছিল না।

বৈপরীত্যের অভিযোগ কতদুর সত্য ?

উপরোক্ত প্রাথমিক সত্যগুলো হৃদয়ঙ্গম করার পর এবার আসুন বিবেচনা করে দেখি যে, কুরআন মুখ্যভাবে তাকদীর সমস্যার আলোচনায় না গিয়েও অন্যান্য

৩· বুখারী, বিয়েসংক্রান্তঅধ্যায়। আজলেরবিবরণ।

বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে নিছক আনুসঙ্গিকভাবে তাকদীর তত্ত্বের ব্যাপারে যেসব ইংগিত দিয়েছে, তাতে সত্যিই কোন বৈপরীত্য আছে কিনা।

যদি বিভিন্ন জিনিসকে কোন জিনিসের কারণ বলে আখ্যায়িত করা হয়, তবে সে ক্ষেত্রে একটিকে আর একটির বিপরীত বলা যায় কেবল তখনই যখন ঐ জিনিসের একটি মাত্র কারণ থাকে। কিন্তু যদি তার একাধিক কারণ থেকে থাকে, তাহলে সে ক্ষেত্রে ঐ জিনিসের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণ ব্যাখ্যা করাতে কোন বৈপরীত্য থাকতে পারেনা। উদাহরণস্বরূপ, আমি যদি কখনো বলি যে, পানি লেগে কাগজ ভিজে গেছে, আবার কখনো বলি যে, আগুন লেগে কাগজ ভিজে গেছে, আবার কখনো বলি যে, মাটি লেগে কাগজ ভিজে গেছে, তাহলে আপনি বলতে পারেন যে, তুমি পরস্পর বিরোধী কথা বলেছ। কেননা কাগজ ভেজার কারণ পানি ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যদি কখনো বলি যে, দেশটিকে রাজা জয় করেছে; আবার যদি বলি যে, সেনাপতি জয় করেছে, আবার যদি বলি যে, সেনাবাহিনী জয় করেছে, আবার কখনো বলি যে, অমুক সাম্রাজ্য কর্তৃক বিজিত হয়েছে, আবার যদি কখনো সেনাবাহিনীর প্রতিটি সৈনিককে বিজয়ের কৃতিত্ব দেই, তা'হলে এইসব কথাকে পরস্পর বিরোধী বলা চলেনা। কেননা বিজয়ের কৃতিত্ব এদের সকলেরই প্রাপ্য। আবার এক এক দিক দিয়ে এদের প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে কৃতিত্বের দাবীদার।

তাছাড়া প্রত্যেক জিনিসে যদি বিভিন্ন কারণের কার্যকারিতা এমনভাবে মিশ্রিত হয়ে যায় যে, শ্রোতার বোধশক্তি কোনভাবেই ঐ জিনিসে কোন কারণটির কার্যকারিতা কতখানি, তা আলাদা আলাদাভাবে নিরূপণ করতে সক্ষম হয়না, অথবা এ ধরনের কোন পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ বা কোন হিসাব নিকাশ বুঝতে পারেনা, তবে সে ক্ষেত্রে বক্তার জন্য সঠিক বাচনভঙ্গী এটাই হতে পারে যে, সে মোটামুটিভাবে প্রত্যেক কারণকে তার জন্য দায়ী বলে অভিহিক করবে, আর শ্রোতা যদি ভুল বুঝার দরুন ঐ জিনিসের জন্য একটা কারণকেই দায়ী করে তবে তা খন্ডন করবে। উদাহরণস্বরূপ এই বিজয়ের ঘটনাকেই ধরুন। এ কাজে রাজা, সেনাপতি, সেনাবাহিনী, সাম্রাজ্য প্রত্যেকটাই আলাদা আলাদাভাবে অবদান রেখেছে। কিন্তু সেই অবদানগুলো এমনভাবে পরস্পরে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে যে, কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বা হিসাব নিকাশ দ্বারাই আমরা কার অবদান কতটুকু, তা নির্ণয় করতে

পারিনা। এজন্য মোটামুটিভাবে সকলের অবদান রয়েছে বলাই সঠিক। কেউ যদি শুধুমাত্র এসবের কোন একটিকেই নিদিষ্টভাবে বিজয়ের কারণ বলে আখ্যায়িত করে, তাহলে তার অভিমতকে ভ্রান্ত বলতে হবে।

মানুষের কর্মকান্ডের অবস্থাও তদ্রূপ। মানুষের সম্পাদিত প্রত্যেক কাজেরই কিছু কারণ থাকে এবং প্রত্যেক কারণই ঐ কাজ সম্পন্ন হওয়ার ব্যাপারে কিছু না কিছু অবদান রাখে। উদাহরণস্বরূপ, এই মুহূর্তে আমি একটা কিছু লিখছি। আমার এই লেখার কাজটা বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাবেন যে, তাতে একটা সুবিস্তৃত কারণ পরস্পরা কার্যকর রয়েছে। যেমন, আমার লেখার ইচ্ছা ও ক্ষমতা, আমার অভ্যন্তরে যে অগনিত শারীরিক ও মানসিক শক্তি রয়েছে, তার ঐ ইচ্ছার অধীন সক্রিয় হওয়া, আর বাইরের অসংখ্য অজানা শক্তি কর্তৃক আমাকে সহায়তা করা।

এবার এই কারণগুলোকে আলাদা আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করুন। এই মুহূর্তে যে অগনিত বাহ্যিক উপকরণ আমার লেখার কাজে সহযোগিতা করছে, তার একটিও আমি তৈরী বা যোগাড় করিনি, আর আমাকে সাহায্য করতে সেগুলোকে বাধ্য করার মত শক্তিও আমার নেই। একমাত্র আল্লাহই এগুলোকে এমনভাবে তৈরী ও সরবরাহ করেছেন যে, আমি যখন লিখতে চাই, তখন এই সকল শক্তি আমাকে সাহায্য করতে থাকে। আর কখনো যদি ওগুলো আমাকে সাহায্য না করে তাহলে আমি লিখতে পারিনা।

অনুরূপভাবে আমি যখন নিজের ওপর দৃষ্টি দেই, তখন আমি বুঝতে পারি যে, আমার জীবন ও অস্তিত্ব, আমার সুন্দরতম দেহকাঠামোর অধিকারী হওয়া, লেখার কাজে আমার শরীরের যেসব অংগ-প্রত্যংগ অংশগ্রহণ করে তা সুস্থ ও অক্ষত থাকা, যেসব প্রাকৃতিক শক্তিকে আমি লেখার কাজে ব্যবহার করি, তা আমার মধ্যে বিদ্যমান থাকা এবং আমার মস্তিষ্কে স্মৃতিশক্তি, চিন্তাশক্তি, জ্ঞান ও অন্যান্য বহু জিনিসের উপস্থিতি এর কোন একটিও আমার কারিগরিরও ফসল নয়, আমার আয়ত্তাধীনও নয়। এগুলোকেও আল্লাহই এমনভাবে বানিয়ে দিয়েছেন যে, আমি লিখতে চাইলে এগুলো আমাকে সহযোগিতা করে। কখনো যদি এর কোন জিনিস আমার সংযোগিতা না করে, তাহলে আমি লেখার কাজে সফল হতে পারিনা।

আমার ইচ্ছা ও ক্ষমতার প্রকৃত স্বরূপ আমার অজানা। আমি শুধু এতটুকু জানি যে, প্রথমে কিছু বাহ্যিক কারণ এবং কিছু আভ্যন্তরীণ কারণে আমার মধ্যে লেখার ইচ্ছা জাগে। তারপর আমি ভাবি যে লিখবো কিনা। তারপর উভয়দিকের তুলনামূলক বিচার–বিবেচনা করার পর লেখার পক্ষেই সিদ্ধান্ত নেই। লেখার প্রতি আগ্রহী হওয়ার পর আমি কাজটি করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে সেজন্য আমার অঙ্গ–প্রত্যঙ্গকে চালিত করি। এই ইচ্ছা ও আগ্রহ থেকে শুরু করে কাজটি সম্পন্ন করা পর্যন্ত যত কিছু আছে, তার কোনটারই আমি সৃষ্টিকর্তা নই। এমনকি কাজের ইচ্ছা হওয়া ও তা সম্পন্ন করার মাঝে কতগুলো আভ্যন্তরীণ শক্তি সক্রিয় থাকে এবং এ কাজে সেগুলোর কতখানি ভূমিকা রয়েছে, তাও আমি এখনো পুরোপুরিভাবে জানতে সক্ষম হইনি। তবে এটা আমি মন দিয়ে উপলব্ধি করি যে, ইচ্ছা ও কার্য সম্পাদনের মাঝখানে এমন একটা স্তর অবশ্যই রয়েছে, যেখানে আমি কাজ করা ও না করার মধ্য থেকে একটিকে স্বাধীনভাবে গ্রহণ করি। আর যখন স্বাধীনভাবে এর কোন একটাকে গ্রহণ করি, তখন অনুভব করি যে, আমি যেটাকে গ্রহণ করেছি, তার পক্ষে নিজের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উপায়–উপকরণগুলোকে কাজে লাগানোর ক্ষমতা আমার আছে। ইচ্ছার এই স্বাধীনতা ও এই ক্ষমতাকে আমি কোন যুক্তি–প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত করতে পারিনা। কিন্তু কোন মানুষের মন থেকে এই স্বতস্ফূর্ত অনুভূতিকে দূর করা কোন যুক্তি–প্রমাণ দ্বারাই সম্ভব নয়। এমন কি কোন চরমপন্থী অদৃষ্টবাদীর মনও এ অনুভূতি থেকে মুক্ত নয়, তা সে আপন দার্শনিক চিন্তাধারার খাতিরে যত তীব্রভাবেই তা অস্বীকার করুক না কেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, লেখার কাজটি সম্পন্ন হতে যতগুলো কারণ বা উপকরণের সক্রিয় ভূমিকা প্রয়োজন, তাকে তিনটে পৃথক ধারায় বিভক্ত করা যেতে পারে।

১ – যেসব বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উপকরণ সংগৃহীত হওয়া লেখার ইচ্ছা করার আগেই অপরিহার্য।

২ – লেখার সিদ্ধান্ত নিয়ে লেখার উদ্যোগ নেওয়া।

৩ – যে সমস্ত বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উপকরণের সাহায্য ছাড়া লেখার কাজ সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়।

উল্লিখিত তিনটি প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রথম ও তৃতীয়টার আওতায় যতগুলো উপকরণ রয়েছে, তা যে একমাত্র আল্লাহ সংগ্রহ করে দিয়েছেন, তিনিই ওগুলোকে উপযোগী ও সহযোগী বানিয়েছেন এবং তার ওপর যে আমার নিয়ন্ত্রণ নেই, সে কথা আগেই বলেছি। এজন্য এগুলোর বিচারে আমার লেখার কাজটা আল্লাহরই কাজ বলে গণ্য হবে। আল্লাহই এ কাজে আমাকে তওফিক দিয়েছেন। বাদ বাকী মধ্যবর্তী স্তরের কার্যক্রম এক হিসাবে আমার কাজ বলে গণ্য হবে। কেননা সেখানে আমি এক ধরনের স্বাধীন কর্ম ক্ষমতা ও ইচ্ছা কাজে লাগিয়েছি। আর এক দিক দিয়ে তা আমি এক ধরনের স্বাধীন কর্মক্ষমতা ও ইচ্ছা কাজে লাগিয়েছি। আর এক দিক দিয়ে তা আল্লাহর কাজ। কেননা তিনি স্বীয় পরিকল্পনার অধীন আমার মধ্যে ইচ্ছা করা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা সৃষ্টি করেছেন এবং স্বাধীনভাবে সেই ইচ্ছা প্রয়োগ করার শক্তি যুগিয়েছেন।

এতো গেল নিছক কাজটির অবস্থা। কাজ তো প্রকৃতপক্ষে একটা তৎপরতা ও উদ্যোগের নাম ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু মানুষের কর্মকান্ড কোন কোন আপেক্ষিক ও গুণগত দিক দিয়ে দুটো বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। একটি হলো তার উৎকৃষ্টতা আর একটি হলো তার নিকৃষ্টতা। নিছক কাজ দেখে তাকে ভালো বা মন্দ কোনটাই বলা চলেনা। তবে মানুষের নিয়ত বা উদ্দেশ্য তাকে ভালো কাজও বানাতে পারে, মন্দ কাজও বানাতে পারে। হাদীসে বলা হয়েছে; (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) (নিয়ত দ্বারাই কাজের গুণাগুণ নির্ধারিত হয়।) উদাহরণস্বরূপ, আমি পথে একটা টাকা পড়ে থাকতে দেখে তুলে নিলাম। আমার তুলে নেওয়াটা নিছক একটা তৎপরতা। একে ভালো বা মন্দ কোনটাই বলার অবকাশ নেই। কিন্তু অন্যের টাকাকে বিনা অধিকারে ভোগ করবো এই যদি আমার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে নিঃসন্দেহে তা নিকৃষ্ট কাজ। আর মালিককে খুঁজে তাকে টাকাটা ফেরত দেবো এই যদি উদ্দশ্য হয়ে থাকে তাহলে তা উৎকৃষ্ট কাজ ও নেক কাজ। প্রথম ক্ষেত্রে আমার নিয়তের সাথে সাথে আরো একটা শক্তির প্ররোচনা সক্রিয় থাকবে। সেই শক্তির নাম

শয়তান। তখন আমার কাজ সম্পাদনে তিনটি পক্ষের সক্রিয় ভূমিকা ও অবদান থাকবে। প্রথমতঃ আল্লাহর, দ্বিতীয়তঃ শয়তানের, তৃতীয়তঃ স্বয়ং আমার। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এ কাজটা হবে দ্বিপক্ষীয়। এক পক্ষ আল্লাহ, আর এক পক্ষ আমি।

সুতরাং আমরা প্রতিটি মানবীয় কাজকে দুই বা তিন কারণে সংঘটিত বলতে পারি। তবে এটা কোনক্রমেই আমাদের বুঝে উঠা সম্ভব নয় যে, কাজ সম্পাদনে এইসব কারণের কোনটি কতখানি কার্যকর ভূমিকা ও প্রভাব রেখেছে। বিশেষতঃ এ হিসাবটা এইদিক দিয়ে আরো জটিল হয়ে পড়ে যে, এইসব প্রভাব সকল মানুষের কাজে সমানুপাতিকভাবে কার্যকর হয়না, বরং প্রত্যেক মানুষের কাজে তা ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ের হয়ে থাকে। কারণ প্রত্যেক মানুষের ভেতরে তার স্বাধীন ক্ষমতা ও বাধ্যবাধকতার পরিমাণ বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। কেউ স্রষ্টার কাছ থেকে অপেক্ষাকৃত প্রবল বাছ-বিচার ক্ষমতা, প্রখরতর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, খোদায়ী গুণপনার প্রতি অধিকতর আকর্ষণ এবং শয়তানী কুপ্ররোচনা প্রতিরোধের তীব্রতর শক্তি নিয়ে এসেছে। আবার কেউবা এসব পেয়েছে স্বল্প মাত্রায়। আর এইসব বৈশিষ্ট্যের পরিমাণগত তারতম্যের ওপরই কাজ-কর্মে মানুষের ব্যক্তিগত দায়-দায়িত্বের কমবেশী হওয়া নির্ভরশীল। আর ঐ বৈশিষ্ট্যগুলোর আনুপাতিক হার এক এক জনের ক্ষেত্রে এক এক রকমের হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় মানুষের কার্যকলাপে তার নিজের, আল্লাহর এবং শয়তানের প্রভাব ও অবদানের এমন কোন অনুপাত স্থির করা সম্ভব নয়, যা সাধারণভাবে সকল মানুষের ভিতরে বিরাজমান।

সুতরাং উপরোক্ত উক্তি অনুসারে মানুষের যাবতীয় কার্যকলাপের জন্য বিভিন্ন কারণ বা উপকরণকে দায়ী করার সঠিক পন্থা এটাই যে, হয় সামগ্রিকভাবে সকল কারণকে তার জন্য দায়ী করতে হবে, নচেত কখনো এক কারণকে, কখনো অন্য কারণকে দায়ী করতে হবে। আর যদি কেউ ভুলবশতঃ এর কোন একটিমাত্র কারণকে দায়ী করে এবং অন্যগুলো দায়ী নয় বলে সাব্যস্ত করে, তবে তা খন্ডাতে হবে।

কুরআনে এই পন্থাই অবলম্বন করা হয়েছে। কুরআনে তাকদীর তত্ত্ব সম্পর্কে যেসব আভাস দেওয়া হয়েছে, সে- গুলো অনুসন্ধান করলে তাকে নিম্নলিখিত কয়টি শীরোনামের অধীন বিন্যস্ত করা যায়ঃ

(১) যেসব আয়াতে আল্লাহকে সকল কাজের কর্তা সাব্যস্ত করা হয়েছে।

যথাঃ

وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ۚ
قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا
يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا (النساء ٧٨)

"তারা কোন কল্যাণ লাভ করলে বলে যে, এটা আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে। আর কোন খারাপ কিছু ঘটলে বলে যে, এটা তোমার কাছ থেকে এসেছে। তুমি বলে দাও যে, সবকিছুই আল্লাহর কাছ থেকে আসে। তবুও তাদের কি হয়েছে যে, কোন কথাই বুঝতে চায়না?" (নিসা–৭৮)

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ
وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (انعام ١٧)

"আল্লাহ তোমার কোন অনিষ্ট করলে তিনি ছাড়া তা দূর করার কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমার কোন উপকার করেন, তবে তিনি তো সর্বশক্তিমান।" (আনয়াম–১৭)

فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ (ابراهيم ٤)

"সুতরাং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা করেন হেদায়াত দান করেন। তিনি মহাপরাক্রান্ত ও মহাবিজ্ঞ।" (ইবরাহীম–৪)

وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يُعَمَّرُ
مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ (فاطر ١١)

"এমন কোন নারী নেই যে গর্ভবতী হয় এবং সন্তান প্রসব করে, অথচ আল্লাহ তা জানেন না, এমন কোন প্রাণী নেই যার আয়ু বাড়ে কিংবা কমে, অথচ তা একটা রেজিষ্টারে লেখা নেই।" (ফাতের-১১)

لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ
وَيَقْدِرُ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (الشورىٰ-١٢٠)

"আকাশ ও পৃথিবীর চাবিকাঠি তাঁরই করায়ত্ত। যাকে খুশী জীবিকা মুক্ত হস্তে দেন, আর যাকে খুশী সীমিতভাবে দান করেন। বস্তুতঃ তিনি সবকিছু সম্পর্কেই ওয়াকিফহাল।" (শুরা-১২০)

وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا فِي الْاَرْضِ وَلٰكِنْ
يُّنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاۤءُ اِنَّهٗ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ (الشورىٰ)

"আল্লাহ যদি তাঁর বান্দাদের জন্য জীবিকা প্রশস্ত করে দিতেন, তাহলে তারা পৃথিবীতে বিদ্রোহে লিপ্ত হতো। অবশ্য তিনি পরিকল্পিতভাবে ইচ্ছামত নাজিল করে থাকেন। আপন বান্দাদের সম্পর্কে তিনি ওয়াকিফহাল এবং তিনি সবকিছুই দেখতে পান।"(শুরা-২৭)

(২) বান্দাকে কাজের কর্তা সাব্যস্ত করা। যেমনঃ

اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا
سَعٰى - (والنجم -٣٨-٣٩)

"একজন আর একজনের দায়িত্ব বহন করবেনা। মানুষ যা চেষ্টা করে তার অতিরিক্ত কিছু তার প্রাপ্য নয়।" (নাজম-৩৮-৩৯)

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا
مَا اكْتَسَبَتْ (البقرة - ٢٨٦)

"আল্লাহ কোন সত্তাকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেননা। সে যা উপার্জন করবে তার সুফল বা কুফল সে নিজেই ভোগ করবে।" (বাকারা–২৮৬)

إِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا (مزمل ١٩)

"এটা তো কেবল একটি স্মরনিকা। এখন যার ইচ্ছা হয় আপন প্রভুর দিকে চলুক।" (মুজ্জাম্মেল–১৯)

(৩) ভালো কাজের কৃতিত্ব বান্দাকে প্রদান। যথাঃ

وَأَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ أُجُوْرَهُمْ
وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ (آل عمران - ٥٧)

"আর যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে, আল্লাহ তাদের পুরোপুরি প্রতিদান তাদেরকে দেবেন। তিনি অন্যায়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।" (আল্ ইমরান–৫৭)

إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا
الصَّلٰوةَ وَمَنْ تَزَكّٰى فَإِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ وَإِلَى
اللّٰهِ الْمَصِيْرُ (فاطر - ١٠٢)

"তুমি কেবল সেইসব লোককেই সাবধান করতে পারবে যারা তাদের প্রভুকে না দেখেও ভয় করে এবং নামায কায়েম করে। যে ব্যক্তি পবিত্রতা অবলম্বন করে, সে নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে। আসলে সকলকে আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে।"(ফাতের–১০২)

وَالَّذِيْ جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهٖ أُولٰٓئِكَ هُمُ
الْمُتَّقُوْنَ (الزمر - ٣٣)

"যারা স্বয়ং সত্যের ধারক ও বাহক এবং সত্যকে স্বীকার করে, তারাই সদাচারী।" (যুমার–৩৩)

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (احقاف-١٢)

"যারা ঘোষণা করেছে যে আল্লাহ আমাদের প্রভু এবং তার ওপর অবিচল থেকেছে, তাদের কোন ভয় বা দুশ্চিন্তার কারণ নেই।" (আহকাফ–১২)

(৪) আল্লাহকে খারাপ কাজের কর্তা সাব্যস্ত করাঃ

أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ
فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ۝ (النساء-٨٨)

"আল্লাহ যাকে বিপথগামী করে দিয়েছেন, তাকে তোমরা সুপথে চালিত করতে চাও না কি?" আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য তুমি কখনো পথ পাবেনা।"(নিসা–৮৮)

وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ
شَيْئًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ۝
(مائدہ-٤١)

"আল্লাহ যাকে বিভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করতে চান, তাকে তুমি আল্লাহর কবল থেকে মোটেই রক্ষা করতে পারবেনা। এরাই সেইসব লোক যাদের মনকে আল্লাহ পবিত্র করতে চাননি।" (মায়েদা–৪১)

وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا
يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى
الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ (انعام - ١٢٥)

"আল্লাহ যাকে বিপথগামী করার সিদ্ধান্ত নেন, তার বক্ষকে এত সংকীর্ণ করে দেন যে, তার মনে হয় যেন আকাশে আরোহণ করছে। এভাবে আল্লাহ বেঈমান লোকদের ওপর অপবিত্রতা নিক্ষপ করেন।" (আনয়াম–১৬৬)

وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا (بنی اسرائیل-٤٦)

"আর আমি তাদের মনের ওপর আচ্ছাদন চাপিয়ে দিয়েছি, যার দরুন তারা এই খোদায়ী বাণী বুঝতে অক্ষম। আমি তাদের কানকেও করে দিয়েছি ভারাক্রান্ত। তাদের ভাবগতিক এমন যে, তুমি যখন কুরআনে এক আল্লাহর কথা বর্ণনা কর, তখন তারা ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়।" (বনী ইসরাইল-৪৬)

(৫) খারাপ কাজের জন্য শয়তানকে দায়ী করাঃ

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ (البقره-٢٦٨)

"শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রের ভয় দেখায় এবং তোমাদেরকে লজ্জাকর কাজ করতে প্ররোচিত করে।" (বাকারা-২৬৮)

وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ۝ (النمل-٢٤)

"আর শয়তান তাদের খারাপ কাজগুলোকে তাদের কাছে চমকপ্রদ করে দেখিয়েছে এবং এভাবে তাদেরকে বিপথগামী করে দিয়েছে। ফলে তারা আর পথ পাচ্ছেনা।" (নামল-২৪)

(৬) খারাপ কাজের জন্য বান্দাদেরকে দায়ী করাঃ

وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ۝ (النساء-٧٩)

"যা কিছু অশুভ ও অকল্যাণ তোমার হয় তা তোমার নিজের কারণেই হয়।" (নিসা-৭৯)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ (البقره-٦)

"প্রকৃত ব্যাপার এই যে, যারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তাদেরকে তুমি সাবধান কর বা না কর সবই সমান। তারা ঈমান আনবেনা।" (বাকারা–৬)

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ
هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ٥ (بقره - ٣٩)

"আর যারা কুফরীতে লিপ্ত হয়েছে এবং আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে তারা দোজখের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।" (বাকারা–৪৯)

وَاَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنٰهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى
فَاَخَذَتْهُمْ صٰعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ٥
(حٰم السجده - ١٧)

"এবার সামুদের কথা শোন। তাদেরকে আমি সঠিক পথ দেখিয়েছিলাম। কিন্তু তারা সঠিক পথ অবলম্বন করার চাইতে অন্ধের মত চলাকেই অগ্রাধিকার দিল। ফলে অপমানজনক শাস্তি সম্বলিত এক ভয়ঙ্কর বিকট শব্দ তাদের ওপর পতিত হলো। তাদের অপকর্মের ফলেই এটা হয়েছিল।" (হামিম সিজদা–১৭)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُوْنَ ٥ (التحريم - ٧)

"হে কাফেরগণ! আজ তোমরা আর ওজর বাহানা করোনা। তোমরা যেমন কাজ করতে তেমনি ফল তোমাদেরকে আজ দেওয়া হবে।" (তাহরীম–৭১)

كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ ٥ وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ٥ وَ
تَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا ٥ وَّتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ٥ (الفجر ١٧-٢٠)

"কখনো নয়! আসলে তোমরা ইয়াতিমকে সম্মান করনা, মিসকিনকে খাওয়াতে পরস্পরকে উৎসাহ দাওনা, মৃত লোকদের পরিত্যক্ত সম্পদ নির্বিচারে আত্মসাৎ কর এবং তোমরা অর্থলিপ্সু।" (ফাজ্র–১৭–২০)

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۝ (الزلزال-٨)

"আর যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণও অন্যায় করবে, সে তা দেখতে পাবে।" (যিলযাল-৮)

(৭) ভালো কাজের সূচনা হয় মানুষের পক্ষ থেকে এবং পূর্ণতা দেওয়া হয় আল্লাহর পক্ষ থেকেঃ

قُلْ اِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ ۝ (الرعد)

"বলঃ আল্লাহ যাকে চান বিভ্রান্ত করে দেন আর যে ব্যক্তি তাঁর প্রতি অনুগত হয় তাকে তিনি স্বীয় পথ দেখিয়ে দেন।"

(৮) মন্দ কাজের সূচনা হয় মানুষের পক্ষ থেকে আর পূর্ণতা প্রাপ্তি হয় আল্লাহর পক্ষ থেকেঃ

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى (النساء ١١٥)

"যে ব্যক্তি হেদায়াতের পথ স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং মুমিনদের পথ বাদ দিয়ে অন্য পথে চলবে, তাকে আমি তার অনুসৃত পথেই চালাবো।" (নিসা-১১৫)

(৯) আবার যেখানে মানুষ নিজের গুনাহর দায়-দায়িত্ব আল্লাহর ওপর চাপিয়ে দিয়ে নিজে দায় এড়িয়ে যেতে চায়, সেখানে তার মনোভাব খন্ডন করা হয়েছেঃ

وَقَالُوْا لَوْ شَآءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنٰهُمْ ؕ مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ
مِنْ عِلْمٍ ۗ اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ۝ (الزخرف-٢٠)

"তারা বলেছে যে, দয়াময় খোদা যদি চাইতেন তাহলে আমরা ফেরেশতাদের পূজা করতামনা। কিন্তু এ ব্যাপারে (আল্লাহর ইচ্ছা সম্পর্কে) তাদের কোন জ্ঞান নেই। তারা কেবল আন্দাজে কথা বলে থাকে।" (যুখরুক-২০)

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا
بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
(الاعراف-٢٨)

"যখনই তারা কোন অশ্লীল কাজ করেছে, তখন বলেছে যে, আমরা আমাদের বাপ–দাদাকে এ রকমই করতে দেখেছি এবং আল্লাহ আমাদেরকে এরূপ করতে আদেশ করেছেন। হে নবী! তুমি তাদেরকে বলে দাও যে, আল্লাহ অশ্লীল কাজের আদেশ করেন না। আল্লাহ সম্পর্কে তোমরা যা জাননা তা বলবে নাকি?" (আরাফ–২৮)

(১০) আর যেখানে মানুষ নিজের চেষ্টা–সাধনাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে এবং তাকদীরকে অস্বীকার করে সেখানে তাও খন্ডন করা হয়েছেঃ

يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ
لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ
(آل عمران-١٥٤)

"তারা বলে যে, কার্য সম্পাদনে যদি আমাদের কোন কর্তৃত্ব থাকতো তাহলে আমাদের লোকেরা সেখানে (যুদ্ধের ময়দানে) নিহত হতোনা। হে নবী! তুমি তাদেরকে বল যে, তোমরা যদি নিজ নিজ ঘরেও থাকতে, তবুও যার নিহত হওয়া ভাগ্যে লেখা ছিল, সে নিজের নিহত হওয়ার জায়গায় আপনা থেকেই পৌঁছে যেত।" (আল ইমরান–১৫৪)

রহস্য উন্মোচন

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় তাকদীর সম্পর্কে যেসব বক্তব্য দেওয়া হয়েছে, তাতে কোন স্ববিরোধতা ও বৈপরীত্য নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা প্রশ্ন থেকে যায়। প্রশ্নটা এই যে, সমগ্র সৃষ্টি

জগতে মানুষের এমন কি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, একাদকে সে অন্য সকল সৃষ্টির ন্যায় আল্লাহর নিরংকুশ কর্তৃত্বের অধীন, আল্লাহর আইনের অক্টোপাশ জালে বন্দী এবং অসহায়, আবার অপরদিকে নিজের কাজে স্বাধীনও, নিজের কার্যকলাপের জন্য দায়ীও, নিজের তৎপরতার জন্য জবাবদিহী করতেও বাধ্য এবং শাস্তি ও পুরস্কারের অধিকারীও? তাছাড়া মানুষের জীবনে যখন স্বাধীনতা ও অধীনতা এমনভাবে মিলেমিশে রয়েছে তখন ন্যায়বিচার কিভাবে সম্ভব, কেননা মানুষের কাজের দায়-দায়িত্ব তার ওপর কতখানি বর্তে, সেটা নির্ণয় করা ছাড়া যথার্থ ইনসাফের সাথে পুরস্কার ও শাস্তির ফায়সালা করা সম্ভব নয়। দায়-দায়িত্বের পরিমাণ নির্ণয় করা ছাড়া এটাও জানা সম্ভব নয় যে, তার কার্যকলাপে তার স্বাধীন ইচ্ছা কতখানি কার্যকর ছিল। এ প্রশ্নটার সমাধানের জন্য যখন আমরা কুরআনের প্রতি নজর দেই, তখন সেখানে আমরা এমন তৃপ্তিকর জবাব পেয়ে যাই, যা দুনিয়ার অন্য কোন পুস্তক বা কোন মানবীয় জ্ঞান-বিদ্যা থেকে পাওয়া যায় না।

সৃষ্টিজগতে মানুষের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবস্থান

কুরআন থেকে আমরা জানতে পারি যে, মানুষের আবির্ভাবের আগে পৃথিবীতে যেসব রকমারি সৃষ্টি বিদ্যমান ছিল, তারা সকলে জন্মগত ও স্বভাবগতভাবে আনুগত্যশীল ছিল। [১] বাছ-বিচার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা তাদেরকে দেওয়াই হয়নি। যাকে যে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সে একটা সুনির্দিষ্ট আইন ও শৃংখলার অধীনে তা সম্পন্ন করবে এবং বিন্দুমাত্রও অবাধ্যতা প্রদর্শন করবেনা এটাই ছিল তাদের কর্তব্য। তাদের মধ্যে ফেরেশতারা ছিল শ্রেষ্ঠতম। আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেনঃ

لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۝ التحريم : ٦

---

[১] শুধুমাত্র জ্বিন জাতি এই মূলনীতির ব্যতিক্রম। জ্বিনের ব্যাপার এখানে আলোচ্য নয়। তথাপি, কুরআন থেকে জানা যায় যে, জ্বিনদের জীবনেও স্বাধীনতা ও অধীনতা মিশ্রিতভাবে বিদ্যমান। তাদের কার্যকলাপের একাংশের ব্যাপারে তারা স্বাধীন এবং জবাবদিহী করতে বাধ্য। তবে যে বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মানুষকে পৃথিবীর খেলাফত দান করা হয়েছে তা তাদের_নেই।

"আল্লাহ তাদেরকে যা কিছু আদেশ করেন, তারা তার অবাধ্য হয়না। যা করতে বলা হয় তারা অবলীলাক্রমে তাই করে।" (তাহরীম–৬)

অনুরূপভাবে আকাশে বিরাজমান বিশালকায় বস্তুরাজিও আল্লাহর সম্পূর্ণ অনুগত ছিল।

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝
وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ۝
لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ
النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۝ (يٰس: ٣٨-٤٠)

"সূর্য স্বীয় গন্তব্যস্থলের দিকে এগিয়ে চলেছে। এক মহাপরাক্রান্ত মহাবিজ্ঞানীর পরিকল্পনা এটা। চাঁদের প্রদক্ষিণ পথও আমি ঠিক করে দিয়েছি। ফলে এক সময়ে সে তার প্রথম বক্র দশায় প্রত্যাবর্তন করে। সূর্যের সাধ্য নেই যে, চাঁদকে ধরে। রাতেরও সাধ্য নেই যে, সে দিনের আগেই চলে আসে। সকলেই সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে একই শূন্যলোকে।" (সূরা ইয়াসীন–৩৮–৪০)

আকাশ ও পৃথিবীর অন্যান্য সৃষ্টির অবস্থাও ছিল তদ্রুপ। যেমনঃ

كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ (الروم - ٢٦)

"সকলেই তার আজ্ঞাবহ।" (রুম–২৬)

لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ۝ يُسَبِّحُونَ
اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ۝ (الانبياء - ١٩، ٢٠)

"আপন প্রতিপালকের আনুগত্যের ব্যাপারে তারা দাম্ভিকতাও প্রদর্শন করেনা, ক্লান্তও হয়না। দিনরাত তাসবীহ করে, একটুও বিশ্রাম নেয়না।" (আম্বিয়া–১৯–২০)

অতঃপর আল্লাহ সিদ্ধান্ত নিলেন যে, স্বীয় সৃষ্টি জগতের মধ্য থেকে কোন এক সৃষ্টিকে সেই দায়িত্বটি অর্পণ করবেন, যা এ যাবত কাউকে দেওয়া হয়নি। তিনি প্রথমে আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিটি সৃষ্টির সামনে দায়িত্বটি পেশ করলেন। কিন্তু প্রত্যেকেই ভাবভঙ্গী দ্বারা নিজ নিজ অযোগ্যতা ও অক্ষমতা ব্যক্ত করলো। অবশেষে আল্লাহ স্বীয় সৃষ্টির আধুনিকতম সংস্করণ প্রকাশ করলেন, যার নাম মানুষ। এই মানুষ সামনে অগ্রসর হয়ে দায়িত্বটি গ্রহণ করলো, যা গ্রহণ করার যোগ্যতা ও হিম্মত আর কারোর ছিলনা।

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ
أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا
جَهُولًا (الاحزاب-٧٢)

"আমি আকাশ, পৃথিবী ও পাহাড়–পর্বতের সামনে দায়িত্বটি পেশ করলাম। কিন্তু তারা সকলেই তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলো এবং ঘাবড়ে গেল। কিন্তু মানুষ তা গ্রহণ করলো। নিঃসন্দেহে সে নিজের প্রতি জুলুমকারী এবং বেকুফ। (কেননা এত বড় দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েও তার গুরুত্ব অনুভব করেনা।)"

এই দায়িত্বটি কি ছিল? আল্লাহর জ্ঞান, শক্তি, নির্বাচনী ক্ষমতা, ইচ্ছা ও শাসন প্রভৃতি গুণ–বৈশিষ্ট্যের একটি প্রতিবিম্ব। এটা তখনও পর্যন্ত আর কাউকে দেওয়া হয়নি। এটা বহন করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা না ছিল ফেরেশতার, না ছিল আকাশের বিশাল বিশাল আলোক পিন্ডের, না পাহাড়–পর্বতের, না পৃথিবীর আর কোন সৃষ্টির। একমাত্র মানুষই আপন স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের বলে এই প্রতিবিম্ব ধারণ করতে সক্ষম ছিল। এজন্য সে এই দায়িত্বভার ঘাড়ে তুলে নিল। আর এজন্যই সে আল্লাহর খলিফা ও প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত হলো।

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً (بقره-٣٠)

"আমি পৃথিবীতে একজন খলিফা নিযুক্ত করতে চাই।" (বাকারা–১৩) আল্লাহর নতুন দায়িত্ব বহনকারী এই খলিফার বৈশিষ্ট্য এই যে. তাকে জন্মগতভাবে অনুগত

ও বশীভূত করা হয়নি।[১] অন্যান্য সৃষ্টির সাথে তার পার্থক্য এখানেই। তাকে অন্যান্য সৃষ্টির ন্যায় সাধারণ নিয়মের আওতায় আল্লাহর আইন ও বিধির অধীন করার পাশাপাশি এমন একটা শক্তিও দেওয়া হয়েছে, যার বলে সে একটা নির্দিষ্ট গন্ডীতে বাধ্যতামূলক আনুগত্য থেকে মুক্ত। সেখানে এটুকু ক্ষমতা তার রয়েছে যে, ইচ্ছা হলে আনুগত্য করতে পারে। ইচ্ছা হলে অবাধ্যতা ও নাফরমানিও করতে পারে। অথচ মানুষ ছাড়া অন্য কোন সৃষ্টির এ ক্ষমতা নেই। যে ব্যক্তি কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে তার কাছে এ পার্থক্যটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। কুরআনে আপনি মানুষ ছাড়া আর কোন সৃষ্টির উল্লেখ এভাবে পাবেন না যে, সে আনুগত্যও করে, নাফরমানিও করে, আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যেও থাকে, আবার সীমা লংঘনও করে। মানুষ ছাড়া আর কোন সৃষ্টির কথা এভাবে বলা হয়নি যে, সে আনুগত্য করলে পুরস্কৃত হয় এবং নাফরমানি করলে শাস্তি পায়। একমাত্র মানুষ সম্পর্কেই বলা হয়েছে যেঃ

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (البقرة-٣٢)

"যারা আল্লাহর সীমা লংঘন করে তারাই জালেম।" (বাকারা-৩২)

وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ (اعراف-٧٧)

"তারা আপন প্রভুর আদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো।" (আরাফ-৭৭)

---

[১] কুরআনের বহু সংখ্যক আয়াত দ্বারা এ তত্ত্বটি প্রমাণিত। যথাঃ

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا (يونس-٩٩)

"তোমার প্রভু যদি ইচ্ছা করতেন তবে পৃথিবীর সকলেই ঈমান আনতো। (ইউনুস-৯১)

وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكُوا (انعام-١٠٠) وغيره

"আল্লাহ যদি চাইতেন তবে কেউ শেরক করতোনা।" (আনয়াম-১০০) ইত্যাদি। এ সব আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, মানুষকে বল প্রয়োগে শেরক থেকে ফিরিয়ে রাখা ও তাওহীদে বিশ্বাস করতে বাধ্য করা স্বয়ং আল্লাহরই_মনোপুতছিলনা।

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْٓا
اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ط (النساء - ٦٠)

"তারা খোদাদ্রোহী শক্তির কাছে বিরোধ মীমাংসার জন্য যেতে চায়। অথচ তাকে অস্বীকার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।" (নিসা–৬০)

مَاظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ٥ (اعراف - ١٦٠)

"তারা আমার ওপর জুলুম করেনা। বরং নিজেদের ওপরই জুলুম করে।" (আরাফ–১৬০)

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ٥ وَمَنْ يَّعْصِ
اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا
فِيْهَا ص (النساء ١١-١٤)

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে, আল্লাহ তাকে এমন বেহেশ্‌ত সমূহে প্রবেশ করাবেন, যার নীচ দিয়ে নদী–নালা সমূহ প্রবাহিত থাকবে। সেখানে এ ধরনের লোকেরা চিরদিন থাকবে। বস্তুতঃ এটা বিরাট সাফল্য। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানি করবে এবং তাঁর সীমা লংঘন করবে, তাকে আল্লাহ দোজখে প্রবেশ করাবেন এবং সেখানে সে চিরদিন বসবাস করবে। আর তারজন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।" (নিসা–১১–১৪)

এ আয়াত ক'টি এবং এ ধরনের আরো অসংখ্য আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, মানুষের মধ্যে এমন একটা শক্তি রয়েছে, যার বলে সে আনুগত্য ও বিরুদ্ধাচরণ দুটোই করতে সক্ষম এবং সেই শক্তির সঠিক ব্যবহার কিংবা অপব্যবহারের পরিণামে সে সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা, সওয়াব কিংবা আযাব, পুরস্কার কিংবা গযবের শিকার হয়ে থাকে। অথচ এই শক্তিটা একমাত্র মানুষের মধ্যেই আছে, অন্য কোন সৃষ্টির মধ্যে নেই।

হেদায়াত ও গোমরাহী

কুরআন এ সমস্যাটাকে আরো খোলাখুলিভাবে বর্ণনা করেছে। কুরআন বলে যে, ন্যায় ও অন্যায়ের বাছ-বিচারের ক্ষমতা মানুষের প্রকৃতিতেই গচ্ছিত রাখা হয়েছেঃ

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (الشمس-٨)

"মানুষকে আল্লাহ পাপাচার ও সদাচার উভয়েরই প্রচ্ছন্ন জ্ঞান দিয়েছেন।"

কুরআন আরো বলে যে,আল্লাহ মানুষকে নেক কাজ ও বদ কাজ উভয়েরই পথ দেখিয়ে দিয়েছেনঃ

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ (البلد-١٠)

"আমি তাকে উভয় পথই দেখিয়ে দিয়েছি।"

অতঃপর তাকে স্বাধীনতা দিয়েছেন যে, যে পথ সে চায় সেই পথই অবলম্বন করতে পারে।

فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا (الدهر-٢٩)

"যার ইচ্ছা হয় আপন প্রভুর পথ অবলম্বন করুক।" (দাহর-২৯)

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ (كهف ٢٩)

"যার ইচ্ছা হয় ঈমান আনুক, যার ইচ্ছা হয় কুফরী করুক।" (কাহাফ-৪৯)

একদিকে তাকে বিপথগামী করার জন্য তার চিরন্তন দুশমন শয়তান রয়েছে। তার কাজ হলো অন্যায় ও অনাচারের পথকে চমকপ্রদ করে তাকে দেখানো এবং তার প্রতি প্ররোচিত করাঃ

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (الحجر-٣٩)

"ইবলিস বললোঃ হে প্রভু, তুমি যখন আমাকে পথহারা করে দিলে, তখন আমিও তাদের সামনে পৃথিবীতে চিত্তাকর্ষক জিনিসগুলো তুলে ধরবো এবং সকলকে পথভ্রষ্ট করবো।" (আল হিজর–৩৯)

• অপরদিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে রসূলগণকে পাঠানো হয় এবং কিতাব সমূহ নাজিল করা হয়। যাতে মানুষকে ন্যায় ও সত্যের সোজা পথ অন্যায় ও অসত্যের পথ থেকে পৃথক করে দেখানো যায়।

جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ

(فطر-٢٥)

"তাদের রসূলগণ তাদের কাছে প্রকাশ্য নিদর্শন সমূহ, পুস্তিকা সমূহ এবং আলোকময় কিতাব সমূহ নিয়ে এসেছিলেন।" (ফাতের–২৫)

অনুরূপভাবে, মানষের অভ্যন্তরে ও আশেপাশে নানা রকমের উপকরণ রয়েছে। এসবের কোনটি তাকে খারাপ কাজের দিকে আবার কোনটি ভালো কাজের দিকে আকৃষ্ট করে। এই উপকরণগুলোর মধ্যে বাছবিচার করার জন্য তাকে বোধশক্তি দেওয়া হয়েছে। নিজের পথ নিজেই বেছে নেওয়ার জন্য তাকে দৃষ্টিশক্তি দেওয়া হয়েছে এবং যে পথ তার ভালো লাগে সে পথে চলার ক্ষমতাও তাকে দেওয়া হয়েছে। সে যদি খারাপ পথ বেছে নেয়, তাহলে আল্লাহ তার ভাগ্যে নির্ধারিত প্রাকৃতিক শক্তি সমূহ ও ঐসব পারিপার্শ্বিক উপকরণগুলোকে তার অনুগত করে দেন এবং ঐ পথটাকে তারজন্য সহজগম্য করে দেন। অনুরূপভাবে সে যদি পুণ্য পথটা বেছে নেয় তবে তাও তারজন্য সুগম করে দেওয়া হয়ঃ

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى
وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى

(الليل ٥-١٠)

"অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে সম্পদ দান করলো, আল্লাহকে ভয় করে কাজ করলো এবং সততার স্বীকৃতি দিল, আমি তারজন্য সহজ পথ সুগম করে দেব।

আর যে ব্যক্তি কার্পণ্য করলো, বেপরোয়া মনোভাব দেখালো এবং সততাকে প্রত্যাখ্যান করলো, তারজন্য আমি কষ্টের পথ সুগম করবো।" (লায়ল–৫–১০)

যে ব্যক্তি গোমরাহী অবলম্বন করে, তার বিবেকে তখনো একটা খোদায়ী শক্তি বিদ্যমান থাকে, যা তাকে সঠিক পথের দিকে আহবান জানাতে থাকে। কিন্তু যখন সে বিভ্রান্তির ওপর বহাল থাকার জন্য জিদ ধরে, তখন ঐ শক্তি ক্রমে দুর্বল হয়ে যেতে থাকে এবং গোমরাহীর ব্যাধি ক্রমেই জোরদার হতে থাকেঃ

فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا (البقرة - ١٠)

"তাদের মনে একটা ব্যাধি রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধিকে বাড়িয়ে দিলেন।" (বাকারা–১০) শেষ পর্যন্ত এমন এক সময় আসে, যখন ঐ খোদায়ী শক্তির আর কোন কার্যকারিতা থাকেনা। তখন তার মনে, চোখে ও কানে এমন সিল পড়ে যায় যে, সে আর সত্য কথাকে বুঝতে পারেনা। সত্যের আলোকে তখন সে আর চিনতে পারেনা। সত্যের আওয়াজ সে আর শুনতে পায়না। ফলে হেদায়াতের সকল পথ তারজন্য রুদ্ধ হয়ে যায়ঃ

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ وَعَلٰى اَبْصَارِهِمْ
غِشَاوَةٌ (البقرة - ٧)

"আল্লাহ তাদের মনে ও কানে সিল মেরে দিয়েছেন। আর তাদের চোখ পর্দায় আচ্ছাদিত।" (বাকারা–৭)

তাই বলে এ কথা মনে করা চাইনা যে, মানুষের স্বাধীনতা ও ক্ষমতা সীমাহীন। কাদরিয়া গোষ্ঠীর অনুকরণে এটা ভাবা ঠিক নয় যে, মানুষকে সব রকমের স্বাধীনতা ও এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। কখনো নয়। মানুষকে যা কিছু ক্ষমতা ও এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে, তা নিশ্চিতভাবে আল্লাহর আইনের অধীন। বিশ্বজগতের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা ও আংশিক ব্যবস্থাপনার জন্য যে আইন বিধান আল্লাহ নির্ধারিত করে রেখেছেন এবং যে আইন বিধানের আওতায় সমগ্র সৃষ্টিজগত পরিচালিত হচ্ছে, মানুষের স্বাধীনতা ও ক্ষমতা সেই আইন–বিধিরই আওতাধীন। বিশ্বনিখিলের পরিচালনা ব্যবস্থায় মানুষের শক্তি–সামর্থ্য এবং তার আত্মিক, মানসিক ও দৈহিক ক্ষমতার জন্য আল্লাহ যে সীমারেখা টেনে দিয়েছেন, তা এক চুল

পরিমাণও সে অতিক্রম করতে সক্ষম নয়। সুতরাং এ সত্য অকাট্যভাবে বহাল রয়েছে যেঃ

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (القمر - ٤٩)

"আমি যে জিনিসই সৃষ্টি করেছি, একটি পরিকল্পনার অধীন সৃষ্টি করেছি।" (কামার–৪৯)

إِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (الطلاق ٣)

"আল্লাহ স্বীয় কাজকে সম্পন্ন না করে ক্ষান্ত হন না। আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের ব্যাপারে একটা পরিকল্পনা স্থির করে রেখেছেন।" (আলা–৩)

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ (انعام - ١٨)

"তিনি স্বীয় বান্দাদের ওপর পরাক্রান্ত।" (আনয়াম–১৮)

ন্যায়বিচার ও কর্তফল

এখান থেকে এ তত্ত্বও অবগত হওয়া যায় যে, সত্যিকার ন্যায়বিচার করা আল্লাহ ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা যে সীমার মধ্যে মানুষ স্বাধীনতা ভোগ করে, সেটা আল্লাহরই নির্ধারিত সীমা। মানুষের কাজ–কর্মে তার স্বাধীন ইচ্ছার ভূমিকা ও অবদান কতটুকু, তা শুধু আল্লাহই জানেন। তিনি মানুষের স্বাধীনতাকে যে সীমারেখা দ্বারা সীমিত করেছেন, তাও আবার দু'রকমের; একটি সামগ্রিকভাবে সমগ্র মানবজাতির স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রিত করে, অপরটি প্রত্যেক মানুষের ওপর ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্নভাবে আরোপিত। প্রথমটা সামষ্টিকভাবে সকল মানব সন্তানের স্বাধীনতাকে সীমিত করে। দ্বিতীয়টা প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন রকমের। তাই শেষেরটার বিচারে প্রত্যেকের জীবনে তার স্বাধীনতা ও বাধ্যবাধকতার পরিমাণ আলাদা আলাদা। নিজ নিজ কাজের দায়–দায়িত্ব বহন করা এবং সেই দায়–দায়িত্ব অনুসারে কর্মফল ভোগ করা স্বাধীনতার সেই পরিমাণের ওপরই নির্ভরশীল, যা প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ কাজে প্রয়োগ করেছে। এ জিনিসটার নিখুঁত পরিমাপ করা এবং এমন নির্ভুল হিসাব করা, যাতে একবিন্দু পরিমাণও কমবেশী না হয়, দুনিয়ার কোন জজ্ বা ম্যাজিষ্ট্রেটের পক্ষে সম্ভব নয়। পরিমাণ নির্ধারণের ও সঠিক হিসাব করার এ কাজ একমাত্র আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তাই

করতে সক্ষম। তিনিই কেয়ামতের দিন আদালত বসিয়ে এ কাজটি করবেন। এ কথাটাই কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় বলা হয়েছেঃ

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ فَاُولٰئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ- وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ فَاُولٰئِكَ الَّذِيْنَ
خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ (اعراف-٨-٩)

"সেদিন একেবারে নির্ভুল পরিমাপ করা হবে। যাদের কাজের ভালোর পাল্লা ভারি হবে তারাই সফলকাম হবে। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারাই হবে সেইসব লোক, যারা আমার নিদর্শনগুলোর সাথে জুলুম করে নিজেদের সর্বনাশ সাধন করেছে।" (আরাফ–৮–৯)

اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ (غاشيه: ٢٥-٢٦)

"তাদেরকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে এবং তাদের হিসাব নেওয়া আমারই দায়িত্ব।" (গাসিয়া–২৫–২৬)

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ
ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ (زلزال-٧-٨)

"যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণও নেক কাজ করবে তার ফল সে দেখবে। আর যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণও খারাপ কাজ করবে সে তার ফল দেখতে পাবে।" (জিলজাল–৭–৮)

বস্তুতঃ কুরআন থেকে তাকদীর তত্ত্ব সম্পর্কে এতটুকুই জানা যায়। এ থেকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে এবং নৈতিক শাস্ত্রে যে জটিল সমস্যাবলী আলোচিত হয়েছে তার সমাধান পাওয়া যায়। তবে আকিদা শাস্ত্রবিদরা এবং দার্শনিকরা যেসব অতি প্রাকৃতিক সমস্যায় দিশেহারা, যেমন আল্লাহর জ্ঞান এবং তাঁর জ্ঞানের আওতাভুক্ত জিনিস সমূহ, তাঁর ক্ষমতা ও ক্ষমতার আওতাধীন জিনিস সমূহ এবং তাঁর ইচ্ছা ও ইচ্ছাধীন জিনিস সমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক কিরূপ, আর তার পূর্বজ্ঞান, চিরন্তন ইচ্ছা এবং নিরংকুশ ক্ষমতার উপস্থিতিতে মানুষ কিভাবে স্বাধীন ইচ্ছা ও ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে, এ জাতীয় প্রশ্ন নিয়ে কুরআন কোন আলোচনাই করেনি। কেননা তা বুঝার ক্ষমতা মানুষের নেই।

অদৃষ্ট রহস্য

(এটা ১৯৪২ সালের ২৩শে অক্টোবর লাহোর বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত একটি কথিকা) (অল্ ইন্ডিয়া রেডিওর সৌজন্যে)

আমাদের ভাগ্য কি আগে থেকেই নির্ধারিত? আমাদের সাফল্য ও ব্যর্থতা, আমাদের উত্থান ও পতন, আমাাদের বিকৃতি ও পরিশুদ্ধি, আমাদের কষ্ট ও সুখ এবং এই পৃথিবীতে আমাদের যেসব জিনিসের সম্মুখীন হতে হয়, সেসব কি অন্য কোন শক্তি বা শক্তি সমূহের সিদ্ধান্তের ফল এবং এগুলো নির্ধারণে আমাদের কি কোন হাত নেই? যদি তাই হয় তাহলে আমাদের কি কোন স্বাধীনতা নেই? আমরা কি এই দুনিয়ায় একেবারেই কলের পুতুল, যাকে অন্য কেউ নাচাচ্ছে? আমাদেরকে কি একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য নিছক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে? আমরা কি দুনিয়ার রঙ্গমঞ্চে এমন অভিনেতা অভিনেত্রী, যার ভূমিকা আগে থেকেই কেউ নির্ধারণ করে রেখেছে?

দুনিয়া ও মানুষ সম্পর্কে কিছু চিন্তা--ভাবনা করে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির মনে এসব প্রশ্ন উদিত হয়ে থাকে। দার্শনিক, বিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক, আইন রচয়িতা, সমাজ, নৈতিকতা ও ধর্ম সম্পর্কে আলোচনাকারী এবং সাধারণ মানুষ সবাইকেই এই জটিল সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়েছে। কেননা প্রত্যেকেরই গাড়ী এখানে এসে থেমে যায় এবং এসব প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক সমাধান, চাই তা ভুল হোক কিংবা সঠিক হোক, না হওয়া পর্যন্ত গাড়ী আর সামনে চলেনা।

একটা সাদামাটা "হাঁ" বা "না" দিয়ে আপনি এ পশ্নগুলোর জবাব দিতে চাইলে দিতে পারেন। হয়তোবা এ জবাবে আপনি তৃপ্তিও বোধ করতে পারেন। কিন্তু আপনি "হাঁ" কিংবা "না" যেটাই বলেন, তা থেকে আরো অসংখ্য প্রশ্ন জন্ম নেবে, যার জবাব হাঁ, বা না দিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়।

আপনি যদি বলেন "হাঁ" তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে এ কথাও মেনে নিতে হবে যে, পাথর, লোহা, গাছ ও ইতর প্রাণীর সাথে মানুষের কোন সত্যিকার পার্থক্য নেই। সকলের মত মানুষও তার ভাগ্যে যা নির্ধারিত রয়েছে তাই করেছে। তাদেরও কোন স্বাধীন ইচ্ছা নেই, মানুষেরও নেই। মৌমাছির চাক বানানো আর মানুষের রেললাইন তৈরী করাতে মানগত পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু গুণগত কোন পার্থক্য নেই। কেননা উভয়েই রেল লাইন ও চাক নিজে করছেনা, অন্য কেউ করাচ্ছে। আবিষ্কারের গৌরব থেকে উভয়েই বঞ্চিত। অনুরূপভাবে, আপনাকে একথাও স্বীকার করতে হবে যে, পৃথিবীর অন্যান্য বস্তুর মত মানুষেরও নিজের কাজ-কর্মের দায়-দায়িত্ব বা কৃতিত্ব কিছুই নেই। একজন মানুষের সৎ কাজ করা এবং একটা মোটর গাড়ীর সুষ্ঠুভাবে চলা একই কথা। কোন মানুষের অপরাধ বা দুষ্কর্ম করা এবং একটা সেলাই মেশিনের খারাপ সেলাই করা দুটোই একই মর্যাদার অধিকারী। ব্যাপার যখন এই, তখন আপনি যেমন "সৎ মোটর গাড়ী", "অভদ্র যন্ত্র" "ঈমানদার ইঞ্জিন" "বদমায়েশ চরকা" ইত্যাদি বলেন না, তেমনি মানুষের ক্ষেত্রেও সৎ ও অসৎ, ভদ্র ও অভদ্র, ঈমানদার ও বেঈমান ইত্যাদি বলা আপনার শোভা পায়না। অথবা যদি আপনি বলেনই (কেননা আপনাকে দিয়ে যা যা বলানো হয় তা বলতে তো আপনি বাধ্য) তবে অন্ততঃ এটা বুঝতে হবে যে, এসব শব্দ অর্থহীন।

তাছাড়া ব্যাপারটা শুধু এখানেই শেষ হয়ে যায়না। ধর্ম ও নৈতিকতার যে রেওয়াজ আমাদের সমাজে রয়েছে, আইন ও আদালতের যে ব্যবস্থা আমাদের দেশে প্রচলিত, জেল, পুলিশ ও অপরাধ তদন্তের যে বিভাগগুলো আমরা কর্মরত দেখতে পাই, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট এবং সংস্কার ও সংশোধনকামী যেসব প্রতিষ্ঠানের আওতায় আমাদের সমাজ কাঠামো গঠিত, তার সবই নিরর্থক ও বৃথা হয়ে যায়। এ কথা সত্য যে, এগুলোর তৎপরতা চলতেই থাকবে এবং এর কোনটাই বন্ধ হবে না। কেননা আপনার মতবাদ অনুসারে এরা সকলেই অভিনেতা এবং পৃথিবীর নাট্যশালায় তাদের সকলকেই নিজ নিজ নির্ধারিত ভূমিকায় অভিনয় করতেই হবে। কিন্তু এ কথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, মসজিদের নামাযী, মন্দিরের পূজারী, আদালতের বিচারপতি এবং চুরি-ডাকাতির অপরাধী সবাই যখন নিছক অভিনেতা সাব্যস্ত হয় এবং উপাসনালয় থেকে শুরু করে জুয়াশালা এবং কয়েদখানা

পর্যন্ত সবই যখন একটা বড় নাটকের বিভিন্ন দৃশ্য বিবেচিত হয়, তখন তার অর্থ এটাই দাঁড়ায় যে, মানুষের গোটা ধর্মীয় ও নৈতিক জীবন আর কিছুই নয়, নিছক তামাশা এবং অভিনয় মাত্র। রাতের অন্ধকারে যে ব্যক্তি নিভৃতে ইবাদাত বা উপাসনা করে এবং যে ব্যক্তি অন্যের ঘরে সিঁদ কাটে, এরা উভয়ে এই তামাশায় কেবল নির্ধারিত ভূমিকায় অভিনয় করে চলেছে। তাদের উভয়ের মধ্যে কেবল এতটুকুই পার্থক্য যে, ডাইরেক্টর একজনকে উপাসকের ভূমিকায় অভিনয়ের দায়িত্ব দিয়েছে, আর অন্য জনকে বলেছে চোরের ভূমিকায় অভিনয় করতে। আমাদের আদালতে জজ্ সাহেব যত নিষ্ঠা ও অভিনিবেশ সহকারেই মামলার শুনানী গ্রহণে নিয়োজিত থাকুন না কেন এবং নিজের জ্ঞান মোতাবেক মামলাকে সঠিকভাবে বুঝে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার যত চেষ্টাই করুন না কেন, আপনার এই তত্ত্ব অনুসারে তিনি এবং বাদী-বিবাদী সবাই শ্রেফ অভিনেতা ছাড়া কিছু নয়। অথচ বেচারারা এমন বিভ্রান্তিতে লিপ্ত রয়েছে যে, তারা নাটকে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও ভাবছে যে, আদালত কক্ষে যথার্থই আদালত চল্‌ছে। আমার প্রাথমিক প্রশ্নগুলোর জবাবে আপনি যে সাদামাটা "হাঁ" জবাবটা দিয়েছিলেন, তার ফলেই এ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে।

বেশ, তাহলে আপনি কি আমার প্রশ্নের "না" সূচক জবাব দেবেন? কিন্তু সমস্যা এই যে, এ ক্ষেত্রেও একটা "না" বলাতেই ব্যাপারটার পরিসমাপ্তি ঘটবেনা। বরং সেইসাথে আপনাকে আরো অনেকগুলো অকাট্য সত্য অস্বীকার করতে হবে। আপনি যখন বলেন যে, মানুষ ভাগ্য আগে থেকে নির্ধারিত নয় এবং তার ভাগ্য কোন বহিঃশক্তির সিদ্ধান্ত দ্বারা তৈরী হয়না। তখন সম্ভবতঃ আপনি এ কথাই বুঝাতে চান যে, মানুষের নিজের ভাগ্য নিজেই গড়ে। অর্থাৎ তার ভাগ্য তার নিজেরই ইচ্ছা ও চেষ্টার ফল। এ ব্যাপারে প্রথম প্রশ্ন জাগে এই যে, আপনার এই উক্তিতে "মানুষ" শব্দের অর্থ কি? ব্যক্তিগতভাবে এক একজন মানুষ? না মানুষের একটা বড় সমষ্টি যাকে সমাজ বা জাতি বলা হয়? না সমগ্র মানব জাতি? আপনার কথার অর্থ যদি এই হয়ে থাকে যে, প্রতিটি মানুষ নিজের ভাগ্য নিজেই গড়ে, তাহলে যে জিনিসগুলোর সাহায্যে ভাগ্য তৈরী হয় তার দিকে একটু তাকান। অতঃপর বলুন যে, এগুলোর মধ্যে কোন্ কোন্‌টি তার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ভাগ্য গড়ার প্রথম হাতিয়ার হলো মানুষের অঙ্গ -প্রত্যঙ্গ, তার মানসিক ও দৈহিক শক্তি এবং তার নৈতিক

গুণাবলী। এগুলোর সুস্থ থাকা না থাকা, এগুলোর মধ্যে ভারসাম্য থাকা না থাকা, কিংবা কমবেশী থাকার অবধারিত ও অনিবার্য প্রভাব পড়ে তার ভাগ্যের ওপর। কিন্তু এই সবকটি জিনিস মানুষ মায়ের পেট থেকেই নিয়ে আসে। আজ পর্যন্ত এমন কোন মানুষ জন্ম লাভ করেনি, যে নিজেকে নিজের পছন্দ ও ইচ্ছা মোতাবেক তৈরী করে এনেছে। তাছাড়া প্রতিটি মানুষ আপন বাপ–দাদার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সুত্রে কিছু বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে থাকে এবং সেগুলো তার ভাগ্যের ভাঙ্গা গড়ায় যথেষ্ট অবদান রাখে। আবার যে পরিবারে, যে সমাজে, যে শ্রেণীতে, যে জাতি বা সম্প্রদায়ে এবং যে দেশে সে জন্ম নেয়, তার মানসিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার অপরিসীম প্রভাব দুনিয়ায় আসা মাত্রই তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এ সকল জিনিস তার ভাগ্য গড়ায় অবদান রাখে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এমন কোন মানুষ কি পৃথিবীতে আছে, যে কোন বংশে, কোন প্রজন্মে ও কোন পরিবেশে জন্ম নেবে, তা নিজের ইচ্ছা ও পছন্দ মাফিক নির্ধারণ করেছে এবং কার কোন প্রভাব গ্রহণ করবে, সেটা নিজেই স্থির করেছে? অনুরূপভাবে দুনিয়ার বহু ঘটনা ও দুর্ঘটনার ভালো মন্দ প্রভাব মানুষের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ভূমিকম্প, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, আবহাওয়া, রোগা–ব্যাধি, যুদ্ধ–বিগ্রহ, অর্থনৈতিক উথান–পতন, আকস্মিক দুর্ঘটনা প্রভৃতি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মানুষের গোটা জীবনের ধারা পাল্টে দেয় এবং অনেক ভেবে–চিন্তে সে নিজের সুখ–শান্তি ও সাফল্যের জন্য যে নীলনকশা তৈরী করে তা ভেঙ্গে তছনছ করে দেয়। পক্ষান্তরে এইসব আকস্মিক ঘটনাবলীই রাতারাতি একজন মানুষকে এমন সাফল্যের স্বর্ণ তোরণে পৌছে দেয়, যেখানে পৌছতে তার নিজের চেষ্টা–সাধনার তেমন একটা ভূমিকা থাকেনা। এগুলো এমন দিব্য সত্য, যা অস্বীকার করা হঠকারিতা ছাড়া সম্ভব নয়। সুতরাং মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য গড়ে থাকে, এ কথা কিভাবে স্বীকার করে নেওয়া সম্ভব?

এখন আপনি নিজের বক্তব্যকে খানিকটা সংশোধন করে হয়তো বলবেন যে, ব্যক্তি নয়, বরং জাতি নিজের ভাগ্য নিজে গড়ে। কিন্তু এ কথাও মেনে নেওয়ার যোগ্য নয়। যেসব উপায়–উপকরণের বলে প্রত্যেক জাতির ভাগ্য তৈরী হয়, তাতে বংশীয় ও প্রজন্মগত বৈশিষ্ট্য, ঐতিহাসিক প্রভাব, ভৌগোলিক অবস্থা, প্রাকৃতিক সমস্যাবলী এবং আর্ন্তজাতিক পরিস্থিতির যথেষ্ট হাত থাকে। এসব উপায়–উপকরণের

উপকরণের প্রভাব মুক্ত হয়ে নিজের ভাগ্য নিজের ইচ্ছামত গড়া কোন জাতির পক্ষেই সম্ভব নয়। তাছাড়া যে প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন আকাশ ও পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা চলছে এবং যাতে হস্তক্ষেপ করা দূরের কথা, তার নিগুঢ় রহস্য পুরোপুরি জানাও কোন জাতির পক্ষে সম্ভব নয়, সেই প্রাকৃতিক নিয়ম বিভিন্ন জাতির ভাগ্যের ওপর এমন প্রভাব বিস্তার করে যে, তা রোধ করা বা তা থেকে আত্মরক্ষা করার শক্তি কোন জাতিরই নেই। এই নিয়ম–বিধি নেপথ্যে থেকেই নিজের কাজ করে যেতে থাকে। কখনো পর্যায়ক্রমে আবার কখনো আকস্মিকভাবে তার তৎপরতার এমন ফল দেখা দেয় যে, উথানরত জাতিগুলোর পতন ঘটিয়ে দেয় এবং পতনোন্মুখ জাতিগুলোর উথান ঘটায়। যা হোক, এতো গেল যে সব উপকরণ সম্পূর্ণরূপে মানুষের অজানা তার কথা। কিন্তু যেসব উপকরণ আপাতঃদৃষ্টিতে মানুষের আয়ত্তাধীন বলে মনে হয়, তার বিশদ পর্যালোচনাও তেমন আশাব্যঞ্জক নয়। একটি জাতির উপযুক্ত নেতৃত্ব লাভ এবং সেই নেতৃত্ব দ্বারা লাভবান হওয়ার জন্য সেই জাতির উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে যে গুণাবলী থাকা জরুরী, তার উপস্থিতি–এ দুটো জিনিসের ওপর একটি জাতির ভাগ্য অনেকাংশে নির্ভরশীল। কিন্তু ইতিহাস থেকে আমরা এমন কোন সাক্ষ্য পাইনা এবং চলমান যুগের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ থেকেও আমরা এমন কোন দৃষ্টান্ত পাইনা যে, কোন জাতি এ দুটো উপকরণ অর্জন করতে নিজের ইচ্ছা ও পছন্দকে স্বাধীনভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছে। আমরা তো এটাই দেখি যে, যখন একটি জাতির উথানের সময় সমাগত হয়, তখন সে ভালো নেতৃত্বও লাভ করে এবং সেই নেতৃত্বের সাফল্যের জন্য যে গুণ–বৈশিষ্ট্য কাম্য, তাও তার মধ্যে সৃষ্টি হয়ে যায়। আবার সেই একই জাতি যখন পতনোন্মুখ হয়, তখন নেতৃত্ব ও আনুগত্যের উভয় যোগ্যতা তার কাছ থেকে এমনভাবে উধাও হয়ে যায় যে, তার অতিবড় দরদী হিতাকাংখীও তা আর ফিরিয়ে আনতে পারেনা। কোন আইনের অধীন জাতি সমূহের ইতিহাসে এইসব উথান–পতন সংঘটিত হয়ে থাকে, তা আমাদের একেবারেই জানা নেই।

এরপর কি আপনি জাতিগুলোকে বাদ দিয়ে সমগ্র মানবজাতি সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করবেন যে, সে সামগ্রিকভাবে নিজের ভাগ্য নিজেই তৈরী করে থাকে? কিন্তু এ কথা বলা আরো জটিল সমস্যাকে ডেকে ানার নামান্তর। হাজারো জাতি

গোষ্ঠী ও বর্ণ বংশে বিভক্ত, দেশে দেশে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য রকমারী সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক এবং অগণিত ভাষায় কথা বলা এই বিশাল ও বিপুল মানবজাতি সম্পর্কে কেউ যদি ধারণা করে যে, এটা একটা সামষ্টিক ইচ্ছা রয়েছে এবং সেই সামষ্টিক ইচ্ছার আলোকে সে ভেবে–চিন্তে নিজের ভাগ্য গড়ে তোলে, তাহলে বলতে হবে যে, সে বাস্তবিক পক্ষে একটা সিদারুণ বিস্ময়কর ধারণা। প্রশ্ন এই যে, এই বিশ্বজোড়া জাতিটি কি সত্যিই এমন একটা সময়সূচী নিজেই তৈরী করে নিয়েছিল যে, অমুক যুগ পর্যন্ত সে পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার করবে, অতঃপর লোহা ও আগুন ব্যবহার করা শুরু করবে। অমুক যুগ পর্যন্ত সে মানবীয় ও দৈহিক শক্তি দ্বারা কাজ চালাবে,অতঃপর যান্ত্রিক শক্তি প্রয়োগ শুরু করবে? সে অমুক শতাব্দী পর্যন্ত কম্পাস ছাড়া জাহাজ ও নৌকা চালাবে, তারপর সফরের দিক নির্ণয়ের জন্য কম্পাস ব্যবহার করবে? এখানে এ প্রশ্নও না উঠে পারেনা যে, এই মানব জাতিই কি আফ্রিকা, আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া ও অষ্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন জাতি–উপজাতির জন্য অর্থাৎ নিজেরই বিভিন্ন অংশের জন্য বিভিন্ন রকমের ভাগ্য নির্ধারণ করেছে? এমন উদ্ভট দাবী উথাপনের কথা কোন সচেতন মানুষ যে ভাবতেও পারে না, তা বলাইবাহুল্য।

এরপর আপনার এই মতে অবিচল থাকার আর কোন উপায় থাকেনা যে মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য গড়ে। কেননা যখন দেখা গেল যে, ব্যক্তিগতভাবেও প্রতিটি মানুষ তার অদৃষ্টের নিয়ামক নয়। কোন জাতি গোষ্ঠীও নয়, এমন কি সমগ্র মানব জাতিও নয়, তখন এই অদৃষ্টের অধিপতি আর কোন্ "মানুষ"কে করা যাবে?

আপনি দেখতে পেলেন যে, যে প্রশ্নগুলো আমি শুরুতে আপনার সামনে রেখেছিলাম, তার জবাব নিছক "হাঁ" দিয়েও দেওয়া যায়না, "না" দিয়েও দেওয়া যায়না। প্রকৃত সত্য এই দুই জবাবের মাঝখানে অবস্থিত। যে মহা– প্রতাপান্বিত ইচ্ছাশক্তি বিশ্বজগতের গোটা ব্যবস্থা পরিচালনা করছে, তার আওতা থেকে মুক্ত হয়ে কোন জিনিসই দুনিয়াতে কোন কাজ করতে সক্ষম নয়। কাজ করা দূরে থাক, আপন অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতেও সক্ষম নয়। একটা সর্বব্যাপী পরিকল্পনা সর্বাত্মক শক্তি ও দাপট নিয়ে আকাশ ও পৃথিবীতে সক্রিয় রয়েছে। কারো সাধ্য নেই এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে চলার, তাকে পাল্টানোর কিংবা তার ওপর প্রভাব বিস্তার

করার। আমাদের যত জ্ঞান–বিজ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা সঞ্চিত রয়েছে, তার সবই এক বাক্যে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, প্রকৃতির এই দোর্দন্ড সাম্রাজ্যে কারোর স্বরাজ ও স্বাধীনতার আদৌ কোন অবকাশ নেই। মহাশূন্যের বিরাট বিরাট নক্ষত্র মন্ডলীকে যে অমোঘ নিয়মের বন্ধন আপন নির্ধারিত কক্ষপথ থেকে চুল পরিমাণও এদিক ওদিক সরতে দেয়না, যে মহাশক্তি পৃথিবীকে একটা নিয়মের অধীন প্রদক্ষিণ করতে বাধ্য করে রেখেছে, বাতাস, পানি, আলো ও শীতাতপের ওপর যে সরকারের নিরংকুশ ও সর্বময় কর্তৃত্ব বিরাজমান, যে মহাশক্তিধর সত্তা পৃথিবীতে মানুষের জীবন ধারণের উপকরণ তার জন্মের আগেই সরবরাহ করে রেখেছে এবং যে শক্তি এমন প্রবল প্রতাপের অধিকারী যে, সে জীবনোপকরণের ভারসাম্যে সামান্যতম হেরফের করে দিলেই গোটা মানবজাতি ও প্রাণীকুল এক নিমেষে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে সেই মহাপরাক্রান্ত শক্তির অধীন থাকা অবস্থায় মানুষের নিজের ইচ্ছামত ভাগ্য গড়ার স্বাধীনতার কথা কল্পনাও করা যায়না। কিন্তু তাই বলে এ কথাও ভাবা ঠিক নয় যে, যে শক্তি আমাদেরকে এই পৃথিবীতে এনেছে, যে শক্তি আমাদেরকে জ্ঞান, চিন্তা–ভাবনা, ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করেছে, যে সত্তা আমাদের মধ্যে এই অনুভূতি জন্মিয়েছে যে, আমাদের কিছু স্বাধীন ক্ষমতা আছে, যে শক্তি আমাদের মধ্যে ন্যায় ও অন্যায়ে এবং নৈতিক ও নৈতিকতা বিরোধী কাজে পার্থক্য করার যোগ্যতা দান করেছে এবং পৃথিবীর কর্মকান্ডে এক ধরনের কর্মপ্রণালী অবলম্বন ও আরেক ধরনের কর্মপ্রণালী বর্জন করার সামর্থ্য দিয়েছে, সে শক্তি আমাদেরকে এসবকিছু নেহাত তামাসাচ্ছলে দিয়েছে। প্রাকৃতিক জগতের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় আমরা চরম ভাবগাম্ভির্য্য ও আন্তরিকতা দেখতে পাই। এখানে কোন রঙ্গ–রসিকতা, ঠাট্টা–তামাসা বা ছিনিমিনি খেলা দেখা যায়না। সুতরাং আমাদের প্রতিটি মানুষ অন্তর দিয়ে যা অনুভব করে, সেটাই প্রকৃত সত্য। অর্থাৎ বাস্তবিক পক্ষে এখানে আমাদেরকে সীমিত পর্যায়ে কিছু স্বাধীনতা দান করা হয়েছে এবং এই স্বাধীনতাকে ব্যবহার করার ব্যাপারেও আমাদেরকে উপযুক্ত পরিমাণে স্বনিয়ন্ত্রিত ও স্বনির্ভর করা হয়েছে। এই স্বাধীনতা ও স্বয়ম্ভরতা আমরা অর্জন করিনি, আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। এর পরিমাণ কতটুকু, এর সীমারেখা কি এবং এর ধরন ও প্রকৃতি কি, তা নির্ণয় করা শুধু কঠিন নয় বরং অসম্ভব। কিন্তু এই স্বাধীনতা যে রয়েছে, তা অস্বীকার করা যায়না। বিশ্বনিখিলের মহাপরিকল্পনায়

আমাদের জন্য এতটুকু স্থানই বরাদ্দ করা হয়েছে যে, আমরা যেন একটা সীমাবদ্ধ পর্যায়ে স্বাধীনভাবে কর্মরত অভিনেতার ভূমিকা পালন করি। এই মহাপরিকল্পনায় আমাদের জন্য যতটুকু স্বাধীনতার অবকাশ আছে, ততটুকু স্বাধীনতাই আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। আর যে পরিমাণ স্বাধীনতা আমরা ভোগ করি, প্রকৃতপক্ষে আমাদের নৈতিক দায়-দায়িত্বও ঠিক ততটুকু। আমরা কতখানি স্বাধীন এবং আমাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে আমাদের দায়-দায়িত্ব কতখানি এই দুটো বিষয় আমাদের জ্ঞানের গন্ডিবহির্ভূত। যে শক্তি স্বীয় মহাপরিকল্পনায় আমাদের জন্য এই স্থান বরাদ্দ করেছে, এ ব্যাপারটা কেবল তারই জানার কথা।

অদৃষ্ট প্রশ্নে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী এটাই। ইসলাম একদিকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর ঈমান আনার দাওয়াত দেয়। এর সুস্পষ্ট মর্ম এই যে, আমরা এবং আমাদের আশপাশে বিরাজমান গোটা বিশ্বজগত আল্লাহর একচ্ছত্র শাসন ও কর্তৃত্বের অধীন এবং সকলের ওপর তাঁর সর্বময় একাধিপতিত্ব বিস্তৃত। অপরদিকে সে আমাদেরকে নৈতিকতার আর্দশ শিক্ষা দেয় এবং ন্যায় ও অন্যায়ে এবং পাপ ও পুণ্যে পার্থক্য দেখিয়ে দেয়। সে আমাদেরকে জানিয়ে দেয় যে, আমরা একটা নির্দিষ্ট পথ অবলম্বন করলে মুক্তি পাবো, আর অন্য পথ অবলম্বন করলে আমাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। আমরা যদি সত্যি সত্যি আপন ইচ্ছা ও পছন্দ অনুসারে আপন জীবনপথ অবলম্বনের স্বাধীনতা ভোগ করি, তাহলেই এই মুক্তির সুসংবাদ ও শাস্তির হুশিয়ারি যুক্তিসঙ্গত হতে পারে।